রূপকথা

বাংলা ভাষাকে জীবিকার ভাষা করে তুলুন

নবম সংখ্যা

মনের মানুষ বিবেকানন্দ

নতুন বছরের সেরা পেশা

চেনা প্রণব মুখার্জির অজানা কথা

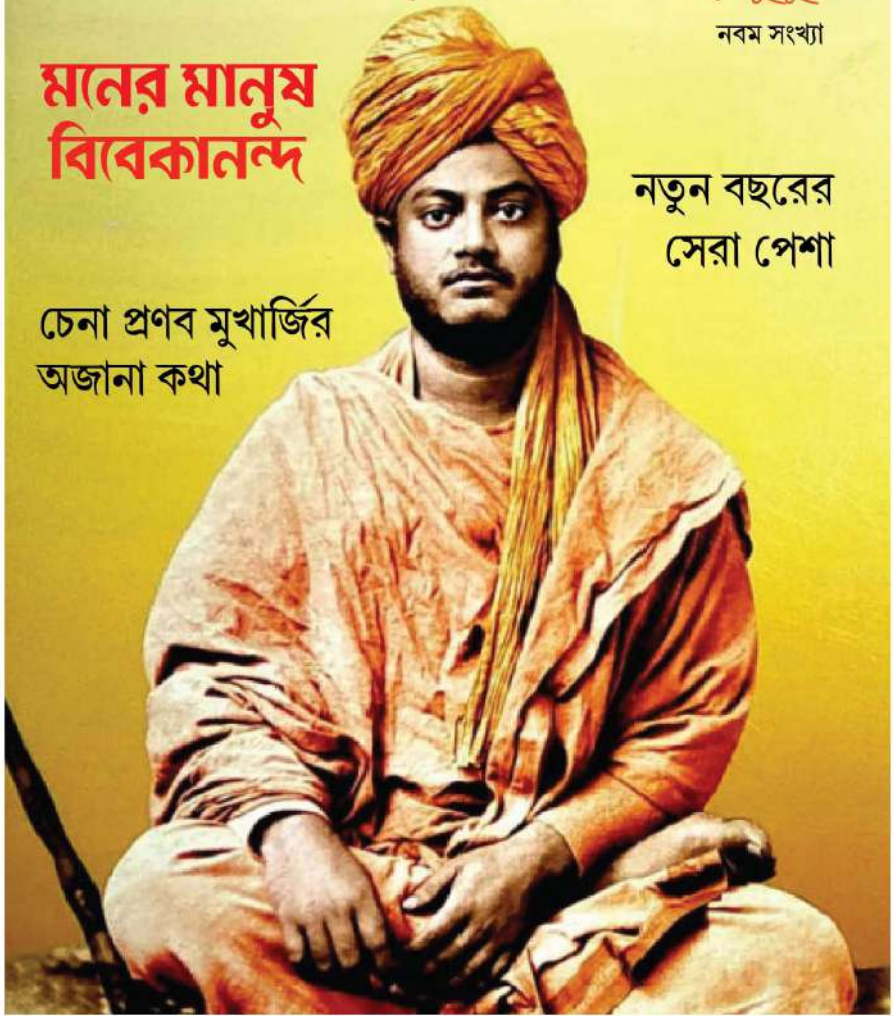

সম্পাদকীয়

ভারতপথিক স্বামী বিবেকানন্দ

কী অসম্ভব জ্যোতি একজন মানুষের! যে জ্যোতিতে সব জাতি উদ্ভাসিত হয়েছিল তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।তবু কি স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশিত পথ আমরা সর্বতোভাবে অনুসরণ করতে পেরেছি? শতাধিককাল আগে যে দূরদর্শিতায় তিনি আধুনিক ভারতের ছবি এঁকেছিলেন, তা ভুলব কীভাবে? গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ, তাঁর ভাবধারা বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়ে যে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েছিলেন, তাও কি কোনোভাবে বিস্মৃত হওয়া সম্ভব? অথচ, কখনই তিনি কাউকে মূর্তিপুজো করতে মাথার দিব্যি দেননি। জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিভা ও পথ নির্দেশ ছিল বিস্ফোরক। বিজ্ঞান, খেলাধুলো থেকে দর্শন এমনকী বন্দুক চালানো থেকে বিভিন্ন ধরনের রান্না কোনটা ছেড়ে কোনটার কথা বলব! মাত্র ৩৯ বছর ৫ মাস ১৯ দিন জীবিত থেকে একজন দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন মানব যা করে গেছেন, তা অসীম। আরও বেশিদিন বাঁচলে কি এই পৃথিবীর অন্য কোনো রূপ হতো? এই মহামানবের জন্মদিনে তাঁর প্রতি কোনো কিছু প্রদর্শনই বোধহয় যথেষ্ট নয়। বারবার মনে হচ্ছে, স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে কোনো কিছু লেখার যোগ্যতাই আমাদের নেই। আমরা তাঁর তুলনায় অতি সাধারণের থেকে নীচের স্তরে থাকা জীবমাত্র। তবুও আমরা সামান্য উপাচারে মনের মানুষ স্বামী বিবেকানন্দকে প্রণাম জানাচ্ছি। বিশ্বের এত অনাচার, এত অন্যায়ে তিনি আমাদের একমাত্র ভরসা। আজও তিনি যুবাদের 'আইকন'। মাঝে মাঝে মনে হয়, স্বামীজি যদি নরঋষি হন, তাহলে সব দেখেও অন্ধ কেন? তিনি কি আমাদের চরম পরীক্ষা নিচ্ছেন?

সূচিপত্র

শুরুর পাতা	৩-৯
চেনা মানুষ অজানা কথা	৫-৬
গল্প	১০-১১
বিশেষ রচনা	১২-১৩
রঙ্গলোক	১৪-১৫
অমৃত কথা	১৬-১৭
কবিতা	১৮-১৯
স্বাস্থ্য	২০-২১
বিশেষ রচনা	২২-২৪
আইন	২৫-২৬
হেঁসেল	২৭
ভ্রমণ	২৮-২৯
বিনোদন	৩০-৩২
ক্যাম্পাস	৩৩
খেলা	৩৪

রূপকথা

প্রথম বর্ষ, নবম সংখ্যা

প্রধান সম্পাদক

মানসকুমার ঠাকুর

নির্বাহী সম্পাদক

সৈকত হালদার

সহ-সম্পাদক

ঈপ্সিতা সেন

সহযোগী -- **মধুমিতা দাস**

পরিচালনা

মানসী রিসার্চ ফাউন্ডেশন

অক্ষরবিন্যাস	প্রচ্ছদ
ইন্দ্রবুবলি	**কুন্তল**

মনের মানুষ স্বামীজি

অনন্ত পুরুষ। তাঁকে নিয়ে আমাদের বিস্ময়ের শেষ নেই। তাঁর বাণী ও আদর্শ আমাদের পাথেয়। যুবদের আইকন। ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষে রইল আমাদের এই শ্রদ্ধাঞ্জলি।

আধুনিক স্বামীজি

জামিতুল ইসলাম, সম্পাদক, 'বঙ্গনিউজ'

ঘটনা ১ : শিকাগোর ধর্মসভায় যোগ দিতে গিয়ে অর্থাভাবে স্বামীজি রাস্তার পাইপের মধ্যে শুয়ে রাত কাটালেন। এরপর রাজসিক আতিথেয়তা পেয়েছেন, কিন্তু আরামদায়ক বিছানায় ঘুমোতে পারেননি। দেশের মানুষের কথা চিন্তা করে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন, শুয়েছেন মেঝেতে।

ঘটনা ২ : আমেরিকানদের বন্দুক চালনা দেখে হেসেছিলেন। তাঁর এই তাচ্ছিল্যের জন্য অপমানিত হয়ে আমেরিকানরা স্বামী বিবেকানন্দের হাতে বন্দুক তুলে দেওয়ার পর তিনি সাঁকোর নীচে ভাসমান সব ক'টা ডিমের খোলা গুলিবিদ্ধ করেন। এর কারণ হিসাবে তিনি একাগ্রতার কথা বলেছেন। আবার এটাও ঠিক একজন সন্ন্যাসী হয়েও বন্দুক চালাতে জানতেন।

ঘটনা ৩ : হোটেলের সুইমিং পুলে মার্কিন মেয়েদের সর্বসমক্ষে স্নান করতে দেখে ভারতে লেখা চিঠিতে উল্লেখ করেছিলেন, আমাদের দেশের মেয়েরা যেদিন এমন আধুনিকা হয়ে উঠবেন, সেদিনই কোটর থেকে প্রকৃত সন্তানরা বেরিয়ে আসতে পারবে।

ঘটনা ৪ : প্যারিসে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর বক্তৃতা শুনতে গিয়ে স্বামীজি মুগ্ধ। জগদীশচন্দ্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বলেন, এই বিজ্ঞানীর বিজ্ঞান চেতনায় আমার বুক গর্বে ফুলে উঠেছে। আসলে সবকিছুর মতো বিজ্ঞানটাও তিনি বুঝতেন। এভাবেই তাঁর আধুনিক মনস্কতার প্রতিফলন বারবার হয়েছে। ধর্মকে দেখতে চেয়েছেন সাধারণ মানুষের চোখ দিয়ে। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মেলবন্ধনে গড়তে চেয়েছেন এক আধুনিক ভারতবর্ষ।

ঘটনা ৫ : তিনি ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী। বিয়েতে তাঁর নিষেধ ছিল। যখন মা সারদামণি এই নিষেধের প্রসঙ্গে বলেছিলেন, বিয়েরও প্রয়োজন আছে, বিবেকানন্দ একথা স্বীকার করেন। যখন তাঁর কোনো শিষ্য ব্রহ্মচর্য পালনে তাঁর অসহায়তার কথা জানান, জৈবিক প্রবৃত্তির কথা তোলেন, তখন স্বামীজি বলেছিলেন, এরকমটা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। আমরা সকলেই জীব মাত্র। কিন্তু তিনি তাঁর আর্দশের সঙ্গে কোনওরকম সমঝোতা করতে চাননি। মানুষের ব্যবহারিক জীবনের প্রসঙ্গে তাঁর নিজস্ব মতকে চাপিয়ে দেননি।

ঘটনা ৬ : কালীঘাটে পাঁঠাবলির সময় যখন তাঁর কোনও শিষ্য জীবহত্যার মতো রক্তপাতের প্রথার আপত্তি করেছিলেন তখন বিবেকানন্দ বলেছিলেন, চারদিকে তো এত রক্তপাত-শুধু এই রক্তপাতেই বিরোধিতা কেন? আবার যখন কেউ গোমাতার সাহায্যকল্পে অনুদান চেয়েছিলেন, তখন মানুষমাতার সাহায্যকল্পে তার দৈন্যতা দূর করার জন্য, 'তাহলে কে সাহায্য করবে', এই প্রশ্ন তুলেছিলেন। স্বামীজির কথা যে কারণে এখনও মানুষকে প্রেরণা দেয়-'যারা ভীরু, কাপুরুষ তারাই সমুদ্রের তরঙ্গ দেখে তীরে নৌকা ডোবায়। মহাবীর কি কিছুতে দিকপাত করে রে?- বিশ্বাস। ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস। আর কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই'।

ঘটনা ৭ : বিবেকানন্দ সন্ন্যাস জীবনের শুরুতে চার বছর সারা ভারত ঘুরেছেন। সাধারণ মানুষের দুর্দশায় ব্যথা পেয়েছেন। একজন ভবঘুরে সন্ন্যাসী, কোনওরকমে জীবনধারণ করেন অথচ প্রয়োজনে অনর্গল ইংরেজিতে কথা বলতেন। তাঁর ব্যক্তিত্বে যে কেউ মুগ্ধ হতেন।

যুবদের সংকটে দিশারি

ড. শঙ্কর ঘোষ, অধ্যাপক ও অভিনেতা

আজকের ভারতবর্ষের এই চরম সংকট মুহূর্তে আলো দেখাতে পারে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনা ও আর্দশ। তাঁর প্রতিটা বাণী, রচনা ও চিঠিতে ছিল ইতিবাচক কথা। যা আমাদের শক্তি ও সাহস জোগায়। সারা দেশের সামনে এখন বিপজ্জনকভাবে দেখা দিয়েছে এই সব সমস্যা ও সংকট- ১. আপামর জনগোষ্ঠীর অতৃপ্ত কামনা ২. ধনতন্ত্রের আগ্রাসী মনোভাব ৩. দুর্বলদের ওপর সবলদের অত্যাচার ৪. পিছিয়ে পড়া দেশের ওপর পুঁজিবাদী দেশের আস্ফালন ৫. বিশ্বজুড়ে বর্ণবৈষম্যের লড়াই ৬. দেশজুড়ে অসহিষ্ণুতার প্রভাব ৭. ধর্মের নামে ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতা ৮.দেশের নানা রাজ্যে ভাষাগত বৈষম্যের অসম লড়াই ৯. রাজনৈতিক নেতাদের বিচ্ছিন্নতাকামী মনোভাবে বিপন্ন জাতীয় সংহতি ১০. আর্দশহীনতায় দিশাহীন ও বিভ্রান্ত যুব সমাজ ১১. দেশজুড়ে নারীনির্যাতন। বলাবাহুল্য, ভারতের পুনর্গঠনে, নতুন ভারত গড়তে স্বামীজি বারবার যুবসমাজে আস্থা রাখেন ও তাঁদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। যুবদের উদ্দেশে আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'হে, মহাপ্রাণ, ওঠ, জাগো! জগৎ পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে-তোমার কি নিদ্রা সাজে? এস, আমরা ডাকতে থাকি, যতক্ষণ না নিদ্রিত দেবতা জাগ্রত হন, যতক্ষণ না অন্তরের দেবতা বাইরের আহ্বানে সাড়া দেন। জীবনে এর চেয়ে আর বড়ো কি আছে, এর চেয়ে মহত্তর কোন কাজ আছে? আমার এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক খুঁটিনাটি সব এসে পড়বে। আমি আটঘাট বেঁধে কোনও কাজ করি না। কার্যপ্রণালী আপনি গড়ে ওঠে ও নিজের কার্যসাধন করে। আমি শুধু বলি- ওঠ, জাগো'। যুবশক্তির জাগরণে তিনি আরও যা বলেছেন তা আজও সমান প্রাসঙ্গিক-

'হে বীর হৃদয় যুবকগণ, তোমরা ঠিক করবে, তোমরা বড়ো বড়ো কাজ করার জন্য জন্মেছ। আমি চাই তোমরা (কাজ করতে করতে) মরেও যাও, তবু তোমাদের লড়তে হবে। সৈন্যের মতো আজ্ঞা পালন করে মরে যাও, নির্বাণ লাভ কর, কিন্তু কোনো প্রকার ভীরুতা চলবে না'।

'তোমার মতো শত শত যুবক চাই, যারা সমাজের ওপর গিয়ে মহাবেগে পড়বে এবং যেখানে যাবে সেখানেই নবজীবন ও আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চার করবে'।

দেশের জাতপাতের বিভাজনকে নিয়ে সচেতন করে স্বামীজি বলেন, 'হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল-আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী, আমার ভাই, তুমিও একটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল- ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী, বল ভাই-ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিনরাত, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর'।

স্বামীজি যুবদের শিক্ষার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেন। তিনি মনে করতেন, শিক্ষা পরিপূর্ণতার এক প্রকাশ। তা মানুষের মধ্যেই থাকে। তিনি মনে করতেন, সমসাময়িক শিক্ষা ব্যবস্থা যে মানুষকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করে না বা মানুষের মধ্যে আত্মনির্ভরতা ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তুলতে

এরপর ২৪ পাতায়

দেশ ও বিদেশে 'কৌটিল্য' ছিলেন প্রণব মুখার্জি

মানস কুমার ঠাকুর

যাঁর কথা বলতে যাচ্ছি, উনি আমার কতটা প্রিয় জানি না, তবে ভারত ও দেশের বাইরেও উনি 'কৌটিল্য' নামে পরিচিত ছিলেন। ওনার সঙ্গে আমার কতবার কথোপকথন হয়েছে বলা মুশকিল। কিন্তু আমার হিসাবে তা ৩০ বারেরও বেশি। এই মুহূর্তে লিখতে বসে তাঁকে নিয়ে আমি অন্তত চার-পাঁচটা ঘটনার কথা অবশ্যই উল্লেখ করব। ২০০৪ সালে ভোটে জিতে আমি পূর্ব ভারতের সদস্য (আইসিএআই) হলাম। তখন আমার ক্ষমতা অনুযায়ী খুঁজতে লাগলাম কোন কোন মন্ত্রী বা সরকারি আধিকারিক আমার জানাশোনা রয়েছেন। প্রথমেই মনে পড়ে দাদার বন্ধু ও আমার খুব কাছের মানুষ মুক্তিদার (মুক্তিধর) কথা। যাঁর সঙ্গে প্রণব মুখার্জির খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। সেই থেকে যতবার ওনার সঙ্গে দেখা করেছি আমাকে মুক্তির ভাই (ওই নামে প্রায়ই ডাকতেন) বলতেন। ২০০৪-২০০৭ সালে জঙ্গিপুরে প্রণব মুখার্জির সঙ্গে বেশ কয়েকবার দেখা করিয়ে দেন মুক্তিদা। তখন বুঝেছিলাম শুধু কাউন্সিল সদস্য হলেই হবে না, দরকার পদ। ২০০৭ সালে ফের ভোটে লড়লাম ও আইসিএআই-র সেক্রেটারি হলাম। চেয়ারম্যান হলেন কে কে সরকার। সর্বভারতীয় সভাপতি হলেন দিল্লি থেকে চন্দ্র ওয়াধার। আমার বেশ মনে আছে কে কে সরকারের সভাপতিত্বে একটা অনুষ্ঠানে প্রণব মুখার্জি প্রধান অতিথি হবেন, তার ব্যবস্থা করতে হবে। এটাই ছিল আমার 'টাস্ক'। আমি সেই চেষ্টাতেই ছিলাম। ওই সময় আমাদের প্রতিষ্ঠানের যিনি সর্বভারতীয় সহ সভাপতি ছিলেন (আমার বিরোধী পক্ষ), উনি হঠাৎ প্রচার করে দেন এটা মানসের কাজ নয়। প্রণব মুখার্জি তখন কেন্দ্রের পররাষ্ট্র দফতরের মন্ত্রী। মুক্তিদার মাধ্যমে প্রদ্যুৎ গুহর সঙ্গে আমার খুব ভালো পরিচয় ছিল। আর উনি ছিলেন প্রণব মুখার্জির ব্যক্তিগত সচিব। যাই হোক, অনুষ্ঠানের দিন আমি স্বশরীরে প্রণব মুখার্জির ঢাকুরিয়ার বাড়িতে যাই। উনি তখন পিয়ারলেস ইন-এর (যেখানে অনুষ্ঠান হবে) দিকে রওনা দিচ্ছিলেন। আমায় দেখে বললেন, 'এই যে মুক্তির ভাই আমার সঙ্গে গাড়িতে এস'। আমি আকাশ থেকে পড়লাম। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলে কথা! তাঁর সঙ্গে আমি এক গাড়িতে পাশাপাশি বসে। মাঝে শুধু একটা বালিশ। অনুষ্ঠানে আসার সময় আমাকে গাড়িতেই প্রশ্ন করেন, কী কী বলতে হবে, সেই সম্পর্কে। মজার কথা গাড়িটা যখন পিয়ারলেস ইন হোটেলে ঢুকছে তখন আমাদের সর্বভারতীয় সহ সভাপতির চোখ ছানাবড়া! আমি সেই মজাটা উপভোগ করছিলাম। এরপর প্রোটোকল অনুসারে আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি ওনাকে নিয়ে চলে গেলেন। আমি পড়ে থাকলাম। ওদিকে অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে। আচমকা আমাদের সভাপতি কাছে এসে বলেন, 'মানস তুমি একটু বলে দাও আমাদের দিল্লিতে অনুষ্ঠানের জন্য'। আমি বললাম, 'স্যার আপনি পাশে বসে রয়েছেন। আপনি বলুন পরে আমি বলে দেব'। ওই অনুষ্ঠানে প্রণব মুখার্জি বলেছিলেন, কস্ট অ্যাকাউন্টিং এমন এক পেশা যার সঠিক প্রয়োগ করলে ভারতের মতো দরিদ্র দেশ আর্থিকভাবে স্বনির্ভরতা পাবে। আর একটা কথা মনে পড়ে। ২০০৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের দু'বার বাজেট হয়। আমি যখন জঙ্গিপুরে ওনার সঙ্গে দেখা করতে

গেলাম, তখন উনি আমাকে বলেছিলেন, 'শুধু পদ নিয়ে বসে থাকলে হয় না, কাজ করতে হয়। প্রফেশনটা দেখ যাতে সমাজের কাজে লাগে'। ওনার কথা শুনে আমি বিস্মিত হয়ে যাই। বাইরে এসে প্রদ্যুৎদাকে প্রশ্ন করলাম, কী হয়েছে? তখন প্রদ্যুৎদা বলেন, 'তোদের প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠানের সর্বভারতীয় সভাপতি এসে এক্সাইজ অডিট নিয়ে কথা বলছিলেন। ওরা কত রিসার্চ করেছে যাতে সরকার বা শিল্পের কাজে লাগে'। বলাবাহুল্য, তখন এক্সাইজ অডিট শুধু কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টরা করতে পারতেন। বাড়ি ফিরে এসে আমাদের সর্বভারতীয় নেতাদের সঙ্গে কথা বলি। কলকাতায় এসে ওই সময়ের সভাপতি কুণাল ব্যানার্জির সঙ্গেও কথা বলি। বলাবাহুল্য, সর্বভারতীয় সভাপতি কুণাল ব্যানার্জি আইসিএআই'র মেম্বারদের জনসভায় বলেছিলেন, 'সিএ-রা চাইতেই পারে কিন্তু কোনওদিন এক্সাইজ অডিট করতে পারবে না'। কিন্তু ১৫ দিনের মধ্যে যখন প্রণব মুখার্জি বাজেট পেশ করলেন, তখন দেখা গেল এক্সাইজ অডিট শুধু কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টরা নয় চ্যাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টরাও করতে পারবেন। দুটো ইনস্টিটিউটের সভাপতির মধ্যে একটা সমঝোতা হয়েছিল। পরের মিটিংয়ে আমি প্রণব মুখার্জিকে প্রশ্ন করেছিলাম, এটা কেন করলেন? ওনার জবাব ছিল, 'আমার কাছে আগে দেশ, সমাজ। তারপর ব্যক্তি।'

নিয়মের কালের স্রোতে একদিন আমি সংস্থার পূর্ব ভারতের সভাপতি হলাম। তখন প্রণব মুখার্জি ভারতের রাষ্ট্রপতি। কোনো অনুষ্ঠানে তাঁকে আনা সহজ নয়। দেশের রাষ্ট্রপতি বলে কথা! ২০১৭ সালের ২২ মে আমার বাবা মারা যান। প্রদ্যুৎ গুহ আমাকে পরের দিন ২৩ মে সন্ধ্যায় সৌজন্যমূলক ফোন করেন। আমি প্রদ্যুৎদাকে বলি, দাদার (প্রণব মুখার্জি) সঙ্গে আর আমার মঞ্চ শেয়ার করা হল না। তখন প্রদ্যুৎদা আমায় বলেন, জুন মাসের শেষে দাদা কলকাতায় আসবেন, তোরা রেডি থাক। জুনের শেষ সপ্তাহে আমরা 'ইন্টারন্যাশনাল গ্লোবাল কনফারেন্স' করলাম। সেখানে ছিলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি, পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী ও ওই সময়ের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল। আমার মনের ইচ্ছা সেদিন প্রদ্যুৎদা পূরণ করেছিলেন।

ওনাকে বলা হত 'সংকট ত্রাতা'। যে কোনো সমস্যাই হোক, তা শীর্ষ ব্যাঙ্কের সমস্যা, আন্তর্জাতিক সমস্যা, দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যা, পলিসি ফিকশেসন, ইন্টারন্যাল ম্যানেজমেন্ট সব ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন মধুসূদন। ১৯৮৪ সালে, যুক্তরাজ্যের ইউরোমানি পত্রিকার একটি সমীক্ষায় তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পাঁচ অর্থমন্ত্রীর অন্যতম হিসেবে বিবেচিত হন। দেশের প্রতি অবদানের জন্য তাঁকে ভারতের সর্বোচ্চ ও দ্বিতীয় অসামরিক সম্মান ভারতরত্ন ও পদ্মভূষণ আর শ্রেষ্ঠ সাংসদ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

তাঁর কেরিয়ার শুরু হয় শিক্ষকতা দিয়ে। ১৯৬৩ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক হন। কিছুদিন সাংবাদিকতাও করেন। ইন্দিরা গান্ধীর হাত ধরে ১৯৬৩ সালে রাজ্যসভার সদস্য হন। গড়ে ১৮ ঘণ্টা কাজ করতেন। সকালে মর্নিংওয়াক করতেন। হবি ছিল বই পড়া। একসঙ্গে ৩টে বই পড়তে পারতেন। মঙ্গলবার ছাড়া প্রতিদিন তাঁর খাবারের তালিকায় থাকত আপেল, মাছের ঝোল ও সাদা ভাত। পুজো করা ছিল তাঁর প্যাশন। প্রতিবার পুজোয় নিজের জেলা বীরভূমে আসতেন। ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পনামাফিক কাজের জন্য তাঁর সুনাম ছিল। ৪০ বছর ধরে ডায়েরি লেখেন ও বলে যান তাঁর মৃত্যুর পর সেটি প্রকাশ করতে। রোজ রাতে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতেন শুয়ে শুয়ে।

প্রণব মুখার্জি বারবার একটা কথা বলতেন, পৃথিবীর মাত্র কয়েকটি দেশে 'কস্ট কনসেপ্ট'কে সঠিভাবে ব্যবহার করা হয়। কোনো জিনিসের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণের জন্য পণ্যের কস্ট ম্যানেজমেন্ট জানাটা খুব দরকার। কিন্তু দুর্ভাগ্য এটা সব জায়গায় করা হয় না। দেশের সামাজি-আর্থিক পরিকল্পনা ও উন্নয়নের জন্য কস্ট ম্যানেজমেন্ট খুব দরকার। তিনি যেখানেই থাকুন, ভালো থাকুন।

সিমলা স্ট্রিটের সাদা বাড়িটি অনেক ইতিহাসের সাক্ষী

কলকাতার সিমলা স্ট্রিটের সাদা বাড়ি। এই বাড়ি অনেক ইতিহাসের নীরব সাক্ষী। বাড়ির খুঁটিনাটি কথা অনেকেরই অজানা। সেসব এখানে তুলে ধরা হল।

বেথুন কলেজ থেকে সিমলা স্ট্রিটের দিকে একটু এগোলেই চোখে পড়ে সাদা বাড়িটি। ৩০০ বছরের বেশি পুরোনো এই বাড়ি না জানি কত ইতিহাসের নীরব সাক্ষী। বছরের পর বছর ধরে অবহেলার পর শেষে ২০০৪ সালে বাড়িটি রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ড. এপিজে আব্দুল কালামের হাত দিয়ে নতুনরূপে উদ্বোধন হয় স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ির। যে বাড়ির আনাচে-কানাচে রয়েছে আদি কলকাতার ইতিহাস। কলকাতার অন্যতম প্রাণপুরুষ বিবেকানন্দ তথা নরেনের শৈশবের ইতিকথা জানে এই বাড়ির দালান, চৌকাঠ। নরেন্দ্রনাথ দত্ত থেকে স্বামী বিবেকান্দ হয়ে ওঠার কাহিনি জানে বিবেকানন্দ রোডের এই বাড়ি। আর ইতিহাসের জীবন্ত সাক্ষীকে আগলে নিয়ে বাড়ির সামনে অতন্দ্র প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে বিবেকানন্দের পূর্ণমূর্তি। ১২ জানুযারি ১৮৬৩, এই বাড়িতেই জন্মেছিলেন নরেন। কেউ বলতেন নরেন, কেউ বলতেন বিলে। বিবেকানন্দের দাদুর তৈরি এই বাড়িতে ঢুকতে নামমাত্র খরচ। আর একবার ঢুকলেই ইতিহাসের অবারিত দ্বার। বাড়ির মাঝের বড়ো দালানেই কেটেছে বিশ্বনাথ দত্ত ও ভুবনেশ্বরী দেবীর আদরের নরেনের ছেলেবেলা। নরেন যেখানে জন্মেছিলেন সেই জায়গাটার পাশেই রাখা রয়েছে একটা পুরোনো ঘড়ি। এই ঘড়িটাই নরেন জন্মানোর পরে ৭টা বাজতে ৫ মিনিট থেকে গিয়েছিল। ছোটো থেকেই ডানপিটে নরেন একদমই ধ্যানট্যান করত না। বরং বক্সিং, তীরন্দাজি, ঘোড় দৌড় এসবের প্রতি আগ্রহ ছিল। সে সবেরই দৃষ্টান্ত বহন করছে এই বাড়িটা। এই বাড়িটি দেখেছে ডানপিটে নরেনকে যাঁকে সারা দুনিয়া স্বামী বিবেকানন্দ নামে জানে। নতুন করে বাড়িটির যখন মেরামতি হয় তখন, স্বাভাবিক কারণে বাদ পড়ে অনেক ঐতিহাসিক জিনিস। যেমন, ওই সময় বাড়িতে যে বাগান ছিল স্বাভাবিক কারণে পরে তা বাদ দিতে হয়। তবুও আজও প্রচুর আসবাবপত্র রাখা আছে যত্নের সঙ্গে। যার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেক। বিবেকানন্দের ব্যবহার করা জামাকাপড়, আসবাবপত্র, বৈঠকখানায় থরে থরে সাজানো হুঁকো- এই সব জিনিস বহন করছে ৩০০ বছরের পুরোনো স্মৃতি। যে ঘরে স্বামীজির শৈশব কেটেছে, সেখানে তিনি গরিবদের মধ্যে সব বিলিয়ে দিতেন। যেখানে বসে বন্ধুদের সঙ্গে ধ্যান-ধ্যান খেলতেন, সেই ঘরদোর, আনাচে-কানাচে, চৌকাঠ-দালান পুরোপুরি বিবেকানন্দময়। ছোটোবেলায় নরেনের ধ্যান খেলার গল্পটা সকলের কাছেই খুব প্রিয়। নরেন চুপচাপ ধ্যান করছিলেন আর একটা সাপ চলে যায় তাঁর ওপর দিয়ে। বন্ধুরা পালালেও তিনি ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। পরে বলেন,

সাপের অস্তিত্ব তিনি টেরই পাননি। সেই ঘটনা মাথায় রেখেই বাড়ির মধ্যে ঠিক ওই জায়গাতেই রাখা আছে বিবেকানন্দের এক ধ্যানযোগী মূর্তি, যার ওপর দিয়ে সাপ চলে যাচ্ছে।

এরকম আরো অজস্র ইতিহাস ছড়িয়ে সারা বাড়িতে। বিবেকানন্দকে নিয়ে তৈরি মিউজিয়ামটার কথাই ধরা যাক। কী নেই সেখানে! ৪০ মিনিট বড়জোর। বিবেকানন্দ সম্পর্কে কিছুনা জানলেও এই মিউজিয়াম জানিয়ে দেবে তিনি কী ছিলেন। অবশ্য নরেনকে পুরো বোঝা কি আদেও সম্ভব? বাড়িটা ঘুরলে অনেক প্রশ্নের উত্তর হয়তো মিলবে। একইসঙ্গে তৈরি হবে অনেক নতুন প্রশ্ন। নিজেকে মনে হবে যেন কয়েক যুগ পিছিয়ে যাওয়া পুরোনো শহর কলকাতার নানা ইতিহাসের নীরব দর্শক। উত্তর কলকাতার অভিজাত দত্ত বাড়ির 'ফ্যামিলি ট্রি', বিবেকানন্দের শৈশব, সিমলা স্ট্রিটের এই বাড়ি, নরেন থেকে বিবেকানন্দ হয়ে ওঠা নিয়ে প্রদর্শিত চিত্র প্রদর্শনী সবই দারুণ। বাড়িটা সংরক্ষণ হতে সময় লেগেছিল পাঁচটি বছর। এরপর বাড়িটা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বর্তায় রামকৃষ্ণ মিশনের ওপর। তবে এই বাড়ি শুধুই যে দর্শনীয় স্থান এমনটা নয়। নানা ধরনের কাজ হয় এখানে। বাড়িটির গায়ে বড়ো বড়ো হরফে লেখা রয়েছে 'স্বামী বিবেকানন্দ অ্যানসেস্ট্রাল হাউস অ্যান্ড কালচারাল সেন্টার'। ৩০ কাঠা জমির ওপর তৈরি মূল বাড়িটা মেরামতির সময়েই সেটাকে কিছুটা বাড়ানো হয়। সেখানে রয়েছে 'কালচারাল' ও 'রিসার্চ' কেন্দ্র। বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কেন্দ্রও এই বাড়িতে। রয়েছে বিশাল লাইব্রেরি। এখানে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের ওপর অসংখ্য বই রাখা আছে। অনায়াসে লাইব্রেরির সদস্য হওয়া যায়। মিশনের তরফে চলে স্পোকেন ইংলিশ ক্লাস। পথশিশুদের শিক্ষাদানও হয়। বছরের বিভিন্ন সময়ে এই বাড়িতে দুঃস্থদের জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজ হয়। প্রতি বছর ১২ জানুয়ারি স্বামীজির জন্মদিবস সাড়ম্বরে পালন করা হয়।

স্বামীজির পোশাকের স্টাইল

স্বামী বিবেকানন্দ মানেই চেনা পোশাক। চেনা ব্র্যান্ড। এই পোশাকের আসল রূপকার কে ছিলেন? এই প্রশ্ন সত্যিই কৌতুহল জাগায়। তখন না ছিলেন অগ্নিমিত্রা পল আর না ছিলেন সব্যসাচী মুখার্জি।

স্বামী বিবেকানন্দ মানে লম্বা কুর্তা, গেরুয়া বসন ও মাথায় গেরুয়া রঙের পাগড়ি। কার কথায় এমন পোশাক ধারণ করেছিলেন স্বামীজি! নাকি নিজের ইচ্ছেতেই এমন সাজ! একটু গভীরে যাওয়া যাক। রামকৃষ্ণের স্মৃতিতে মঠ তৈরির জন্য অনেক টাকার দরকার। স্বামীজি ঠিক করলেন, দেশের নানা প্রান্তে গিয়ে টাকা জোগাড় করবেন। সেই মতো গেলেন দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে। সেখানে আলাপ হল রামনাদের রাজার সঙ্গে। কন্যাকুমারীতে এক শিলাখণ্ডে বসে তিনদিনের ভারত ভাবনা ধ্যান করলেন। তারপর ঠিক হল, তিনি শিকাগো ধর্ম মহাসভায় যোগ দেবেন। গেলেন রামনাদ রাজার কাছে। প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর নাম কী হবে, সেটাও ঠিক করে দিলেন রাজা। ভারতীয় সংস্কৃতিকে সঠিকভাবে তুলে ধরা যায়, এমন পোশাক পরার পরামর্শ দিলেন সেই রাজাই। হিন্দু ধর্মে ত্যাগের মহিমা বোঝাতে গেরুয়া রঙের পোশাক তৈরি হল। আর এই গেরুয়া থেকেই আসে ভারতের জাতীয় পতাকার ভাবনা। যখন জাতীয় পতাকা তৈরির প্রক্রিয়া চলছিল, তখন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রস্তাব করেন, জাতীয় পতাকার শীর্ষের বর্ণ হোক গেরুয়া। সেই প্রস্তাব মেনেও নেওয়া হয়। মাঝে শান্তির প্রতীক সাদা। স্বামীজি নিজেও গেরুয়া কুর্তার তলায় সাদা পোশাক পরতেন। এর নানারকম ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। অনেকে বলেন, আমেরিকাগামী জাহাজে অনেক সময় সূর্যের আলোর মধ্যে কাটাতে হতো। তাই চড়া রোদ থেকে বাঁচতে স্বামীজি সাদা পোশাক পরতেন। কিন্তু আমেরিকায়

পৌঁছোনোর পর দেখলেন, সেখানে খুব শীত। রাতে শীতের হাত থেকে বাঁচতে একটা প্যাকিং বাক্সের মধ্যে আশ্রয় নেন। তিন সপ্তাহ বস্টনে কাটিয়ে ফের আসেন শিকাগোয়। সেবার আশ্রয় নেন মিসেস হেলের বাড়িতে। মিসেস হেল তাঁকে একটা উঁচু জুতো, একটা আলখাল্লা, একটা কোট ও জামা দিয়েছিলেন। সেই পোশাকেও তাঁর ছবি রয়েছে। তবে বিবেকানন্দ বলতে এক কথায় আমরা সেই পাগড়িধারী বিবেকানন্দকেই বুঝি। সেই পোশাক, যা তাঁর মৃত্যুর এতগুলো বছর পরেও এখনও আধুনিক।

খাদ্যরসিক বিবেকানন্দ

খাদ্যরসিক বিবেকানন্দ খেতে ভালোবাসতেন পাঁঠার মাথা কড়াইশুঁটি দিয়ে। এছাড়া বিরিয়ানি, ইলিশ মাছের নানা পদ। এক কথায় তিনি ছিলেন ভোজনরসিক। স্বামীজির খাদ্যপ্রীতির কথা জানাচ্ছেন **সমুদ্র সেন**।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের প্রতি যেমন ছিল অশেষ প্রেম, তেমনই তাঁর জীবনকাহিনি থেকে জানা যায় খাদ্যপ্রেমের কথা। স্বামীজি নিজে ভালো রাঁধতেন। শিষ্য ও অনুরাগীদের বাড়িতে গেলে অতিথি সেবা নেওয়া দূরের কথা, নিজে রান্না করে সবাইকে খাওয়াতেন।

সারা বিশ্বজুড়ে স্বামীজি বেদান্তের পাশাপাশি বিরিয়ানিরও প্রচার করেন। রসিক স্বামীজি এক জায়গায় বলেছিলেন, 'ভারতীয় মশলায় রসনায় বিরিয়ানিতে যার তৃপ্ত হয়নি সে সঠিক ভোজনরসিক নয়।' মোগলাই খানা, বিরিয়ানি, পোলাও সব বাদশাহী খাবারের সমান ভক্ষক ছিলেন স্বামীজি। তিনি বলতেন, 'যে রান্না ভালো করতে পারে না, সে কখনও পাকা সাধু হতে পারে না। শুদ্ধ মনে এক চিত্তে না রাঁধলে খাদ্যদ্রব্য সু-স্বাদু হয় না'। যে কাজ করুন না কেন তাতে চাই মনোসংযোগ, সেটা ধ্যান, তপস্যা বা নিছকই উদরপূর্তি করা হোক।

যৌবনে নরেন মিষ্টি খাওয়ার লোভে কলকাতা থেকে দক্ষিণেশ্বর চলে যেতেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে পরম যত্নে মিষ্টি খাওয়াতেন। স্বামীজি খুব ভালোবাসতেন লঙ্কা খেতে। ঝাল খাওয়াটা ছিল তাঁর আসল মেজাজ। ভালোবাসতেন মুগের ডাল, অড়হর ডাল খেতেও। ১৮৯৬ সালের ১৪ এপ্রিল স্বদেশে গুরুভাই স্বামী ত্রিগুণাতীতনন্দকে চিঠি লেখেন, 'মুগের ডাল তৈয়ার হয় নাই মানে কী? ভাজা মুগের ডাল পাঠাইতে আমি পূর্বেই নিষেধ করিয়াছি। ছোলার ডাল ও কাঁচা মুগের ডাল পাঠাইতে বলি। ভাজা মুগ এতদূর আসিতে খারাপ ও বিস্বাদ হইয়া যায়। সিদ্ধ হয় না। যদি এবারও ভাজা মুগ হয়, টেমসের জলে যাইবে'। গুরুভাইকে লেখা চিঠিতে ভারতীয় রান্নার বিশ্বব্যাপী প্রচারে তিনি লিখছেন, 'দয়ালবাবুকে বলবে যে মুগের ডাল, অড়হর ডাল প্রভৃতি ইংল্যান্ডে ও আমেরিকায় খুব একটা ব্যবসা চলতে পারে। ডাল-স্যুপ উইল হ্যাভ আ গো ইফ প্রপারলি ইনট্রোডিউসড'। স্বামীজির চিঠির এই বক্তব্য থেকে একদিকে তাঁর বাণিজ্যিক মানসিকতা ও অন্যদিকে, তাঁর খাদ্যের প্রচারের ভাবনার প্রকাশ পায়।

লস অ্যাঞ্জেলসে এক ঐতিহাসিক বক্তৃতা দিয়ে বান্ধবী মিস জোসেফিন ম্যাকলাউডের সঙ্গে বাড়িতে ফিরে গভীর চিন্তিত বিবেকানন্দ। আচমকা উত্তেজিত হয়ে বললেন, ইউরেকা। পেয়েছি। ম্যাকলাউড জানতে চাইলেন, কীসের কথা বলছেন? স্বামীজী বললেন, 'মুলিগাটান স্যুপটি কীভাবে রান্না করা উচিত। আমি বুঝেছি, পাতাগুলো আগে দিতে নেই। ওগুলো পরে দিতে হয়, তবে অমন সুগন্ধ হয়'।

একবার স্বামীজি শিষ্যদের নিয়ে ক্যুইজ করলেন, বললেন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে তাঁকে প্রমাণ সাইজের দু'খানা জিভে গজা পুরস্কার দেওয়া হবে। সেই প্রশ্নটি ছিল, কোন দেশের সম্রাট, সন্ন্যাসী ও রাঁধুনিকে একই নামে ডাকা হয়? উত্তর হল- ইন্ডিয়া। শব্দটা হল, মহারাজ। একমাত্র ভারতে সম্রাট মহারাজ, সন্ন্যাসী মহারাজ আবার রাঁধুনিও মহারাজ।

১৮৯০ সালের ডিসেম্বরের এক শীতের সন্ধ্যায় পরিব্রাজক বিবেকানন্দ কয়েকজন গুরুভাই নিয়ে হাজির হলেন মিরাটে। এখানকার **এরপর ১১ পাতায়**

উত্তরণ

রুমা ভট্টাচার্য

এই কাহিনিটি জীবনের গল্প, ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প। এক নারী কীভাবে আর এক নারীর সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করে, সেই প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে তাকে স্বনির্ভর করে তুলতে সাহায্য করল, এ তারই গল্প। একে গল্প বলার চেয়ে সত্য ঘটনা বলাই ভালো। আমারই চেনা পরিচিত একজনের জীবন-আলেখ্য।

কাটোয়ার স্টেশন মার্কেটে আজ তৃণলতা টেলারিং হাউজ-এর নতুন ঝাঁ চকচকে শাখার শুভ উদ্বোধন। পুরোনো মূল শাখাটি কাটোয়া স্টেশন থেকে অনেকটা ভেতরে ডুমুরপোঁতা গ্রামে। ব্যবসার সিংহভাগই নিয়ে আসা হয়েছে এই নতুন শাখায়।

সকাল থেকেই তুমুল ব্যস্ততা। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বড়ো শোরুমের একদিকে টেলারিংয়ের ব্যবস্থা, অন্যদিকে, নিজেদেরই তৈরি রেডিমেড গার্মেন্টস বিক্রির জন্য ডিসপ্লেতে রাখা।

ডেকোরেটার এসে সুন্দর করে লাইট লাগিয়ে সাজিয়ে দিয়ে গেছে। এখনও সন্ধে হতে কিছু বাকি। সন্ধের পরে নিমন্ত্রিতরা এলে কেক কাটা হবে।

প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার শ্রীমতী ললিতা রায় নজর রাখছেন সবদিকে। স্বপ্না, রীতা, কাজলরা যদিও সবকিছু পরিপাটি করে রেখেছে, তবু চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছেন ললিতা। পরনে হালকা বাদামী খোলের ওপর সাদা বুটির তাঁত, চোখে চশমা, চুলের সামনে সাদার আভাস ব্যক্তিত্বে আলাদা মাত্রা এনেছে তাঁর।

বড়ো হলঘরটিতে চক্কর কেটে প্রবেশদ্বারের পাশের দেওয়ালে বড়ো ফ্রেমে বাঁধানো ছবিটির দিকে তাকিয়ে একটু আনমনা হয়ে পড়লেন তিনি। ছবিতে পরানো মোটা রজনীগন্ধার মালাটি দু'হাতে ধরে একটু সোজা করলেন, ছবির দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করলেন, তুই দেখছিস তো ছোটো?

ছবির ভেতর থেকে দুটো চোখ একমুখ হাসি নিয়ে তাকিয়ে থাকে ললিতার দিকে। সেদিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন ললিতা। হারিয়ে যান সেই দিনগুলোতে...

বৌমা, অ বৌমা...ওমা তুমি এখানে বাছা! আর আমি সাত রাজ্যি খুঁজে মরচি! বলি কলকেতার মেয়ে বলে কি পুকুর জেবনে দ্যাকোনি গা, হাঁ করে কী জলের দিকে চেয়ে রয়েচো বাপু!...সাঁজ লেগে গেল, চা-টা বসাবে তো নাকি?

শাশুড়িমা এখনও ললিতাকে নিজের বলে ভাবতে পারেন না। বিয়ের দু'বছর হয়ে গেছে। সুযোগ পেলেই 'কলকেতার মেয়ে' বলে খোঁটা দেন। হুঁহ, ভারি তো কলকাতা! কামালগাজী থেকে আরও বেশ ভেতরে ললিতার বাপের বাড়ি।

অবশ্য পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার প্রত্যন্ত গ্রাম ডুমুরপোঁতায় তার শ্বশুরবাড়ির হিসেবে ধরলে ওর বাপেরবাড়ি কলকাতার কাছেই বলতে হয়।

কামালগাজী থেকে কিছুটা ভেতরে হলেও এমন গ্রাম্য পরিবেশ ললিতার দেখা নেই। প্রথমদিকে ললিতা এই পরিবেশে হাঁপিয়ে উঠত, সত্যি বলতে এখনও খুব সুখে কিছু নেই সে।

পরিবার ছোটো--শাশুড়ি, বর তমাল আর দেওর প্রবাল। কিন্তু শাশুড়িমা নিজেই একাই একশো মানুষের সমান। প্রাণপাত করেও ওনার মন পাওয়া যায় না।

বৌমা, আবার তুমি এঁটো সকড়ি একেক্কার করলে! উফঃ কিচুই কি শেকায়নি তোমাকে তোমার মা?...সবকিছুতেই উনি ঝাঁপিয়ে পড়েন ললিতার ওপর।

ললিতার মায়ের এত সংস্কার ছিল না। খুব সাচ্ছল্য না থাকলেও যথেষ্ট উদারমনা ছিলেন ললিতার মা, বাবা। সামান্য আয়ে দুই মেয়ের পড়াশোনা চালিয়ে বাবার ক্ষমতায় কুলোয়নি এর চেয়ে ভালো সম্বন্ধ

জোটানোর।

সেবার বাড়ি গেলে মিতু বলল, ইস দিদি, তুই কেমন গেঁয়ো মতো হয়ে গেছিস রে! কী করিস সারাদিন, নিজের একটু যত্নআত্তি করিস না? তমালদাই বা কেমন, কিছু বলে না তোকে?

ম্লান হেসেছিল ললিতা। ধুর, ওর সময় কোথায়, মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ। দিনরাত ছুটছে, শুধু রাতটুকু দেখা হয়। আমার মুখের দিকে তাকাবে কখন ও?

হুম। আর তোর সেলাই?...চুলোর দোরে দিয়ছিস সেসব?

ওরে বাবা ঘরের বৌ সেলাইকল চালাবে?

প্রভা দেবী চ্যালাকাঠ ভাঙবে পিঠে... হাসতে হাসতে বললেও শেষের দিকে গলাটা কেমন ধরে আসে ললিতার।

গলা ঝেড়ে বলে, আমার কথা ছাড়, তোর কথা বল মিতু।

আমার প্ল্যান ছকা আছে, গ্র্যাজুয়েশন করে যা পাব কাজ করব, তোর মতো এমন হাল ছেড়ে দেব না।

সত্যিই ললিতা পারে না তেমনভাবে ভাবতে। অপূর্ব সুন্দর হাতের কাজ জানত সে, সেলাই শিখেছিল পড়াশোনার পাশাপাশি। কোনো কাজেই লাগাতে পারল না সেসব।

এই পুকুরপাড়টায় বেশ লাগে মাঝেমাঝে বসতে। চুপচাপ চেয়ে দেখে সবজেটে জলে মাছেদের বুড়বুড়ি কেটে খেলা, হাওয়ায় জলে ছোটো ছোটো ঢেউ ভাঙা।

কী আর হবে...একটা জীবন তো শুধুই ক'টা বছরের সমষ্টি...এভাবেই বয়ে যাবে...

আর একেবারেই যেদিন যেতে চাইবে না, পুকুরের জল তো রইলই হাতের কাছে!

(চলবে)

খাদ্যরসিক স্বামীজি

৫ পাতার পর

২৫৬ নং রামবাগে লালা নন্দরাম গুপ্তের বাগান বাড়িতে কয়েকদিন ছিলেন স্বামীজি। সেবার আফগানিস্তানের আমির আবদার রহমানের এক আত্মীয় সাধুদের পোলাও খাওয়ানোর ব্যবস্থা করলেন। রান্নার দায়িত্বে ছিলেন স্বামীজি। স্বামী তুরীয়ানন্দকে খাওয়ানোর জন্য একদিন নিজে বাজার থেকে মাংস আনেন। ডিম জোগাড় করেন। উপাদেয় পদ তৈরি করেন। পোলাও রাঁধা হল। মাংসের কিমা তৈরি হল। কিন্তু কিছুতেই শিক কাবাব তৈরি করা যাচ্ছে না। শিক পাওয়া যাচ্ছে না। তখন স্বামীজি সামনের নিম গাছ থেকে গোটা কয়েক ছোটো ডাল ছিঁড়ে নিয়ে তাতেই কিমা জড়িয়ে কাবাব করে সবাইকে খাওয়ালেন। কিন্তু নিজে খেলেন না। বললেন, 'তোমাদের খাইয়ে আমার বড়ো সুখ হচ্ছে'।

সাধু-সন্ন্যাসীরা গাঁজায় টান দেন। স্বামীজির নেশা ছিল চুরুট খাওয়া। চুরুটের সুখটানে ছিল তাঁর আনন্দ। আর মাছের মধ্যে প্রিয় ছিল ইলিশ। ইলিশ মাছের ঝাল-অম্বল ও ভাজা পরম যত্ন করে খেতেন। ইলিশের সঙ্গে পুঁইশাক দিয়ে খেতে পছন্দ করতেন। স্বামীজি একবার বাংলাদেশের পদ্মা নদীতে ভ্রমণ করছেন, গোয়ালনন্দ ঘাটে দেখেন মাঝিদের জালে রুপোলি শস্য উঠেছে। এক টাকা দিয়ে বেশ কয়েকটি ইলিশ কিনলেন। সাধ হল পুঁই-ইলিশের। এক চাষির বাড়িতে গেলেন স্বামীজি। পুঁইশাক নিলেন। শিষ্য রান্না করলেন। পরিতৃপ্ত হলেন স্বামীজি।

পরিব্রাজক জীবনে তিনি কতদিন অনাহারে কাটিয়েছেন। একবার আলমোড়ার উপকণ্ঠে ক্ষুধা ও পথশ্রমে পরিশান্ত স্বামীজি ভূমিশয্যা নিলেন এক গোরস্থানের সামনে। এক মুসলিম ফকির এক ফালি শসা এনে তাঁর হাতে দিলেন। এই ঘটনার কথা স্মরণ করে স্বামীজি বলেন, 'আমি আর কখনও ক্ষুধায় এতটা কাতর হইনি'। স্বামীজি বলেন, খালি পেটে ধর্ম হয় না। দেশের মানুষ যাতে দু'মুঠো খাবার পায়, তার জন্য সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন তীব্র ব্যাকুল। স্বামীজি বলেন, 'যখন টাকা আসবে তখন মস্ত একটা কিচেন করতে হবে। অন্নসত্রে কেবল দীয়তং নীয়তং ভুজ্যতম-এই রব উঠবে। ভারতের ফেনা গঙ্গায় গড়িয়ে পরে গঙ্গার জল সাদা হয়ে যাবে। এই রকম অন্নসত্র হয়েছে দেখব। তবে আমার প্রাণটা ঠান্ডা'।

ভোজনরসিক বাঙালি ভোজনের আগে ঈশ্বর-আল্লার নামের পর অবশ্যই স্মরণ নেবেন ভারতপথিক বিশ্ববরেণ্য স্বামীজির, তবেই জীবন সার্থক হবে।

কেশব চন্দ্র সেন আমার মননে

প্রণব কুমার সেন

রাজা রামমোহন রায়, ডিরোজিও'র পরবর্তী সময় বাংলার নবজাগরণ যেসব মনীষীদের হাত ধরে এগিয়ে ছিল তার মধ্যে কেশব চন্দ্র সেনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আমার প্রপিতামহ স্বর্গীয় কৃষ্ণ বিহারী সেন ছিলেন কেশব চন্দ্র সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। আমি প্রণব কুমার সেন, পিতা স্বর্গীয় পূর্ণেন্দু কুমার সেন প্রাক্তন আইএনএ, লেফটেন্যান্ট হিসেবে সুভাষ চন্দ্র বসুর সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করেন।

কেশব সেনের ঠাকুরদা রাম কমল সেন গরিফা থেকে ভাগ্যান্বেষণে কলকাতায় পাড়ি দেন। নিজ গুণে কালক্রমে কলকাতার সুধী সমাজে সুপ্রতিষ্ঠ হন। সে সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের মিন্ট-য়ের দেওয়ান কাজের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়। সেই সময় ১০০০ টাকা সিকিউরিটি ডিপোজিট দিয়ে ওই কাজে যোগদান করতে বলে। রাম কমল সেন সেই পদের যোগ্য নির্বাচিত হন। কিন্তু সিকিউরিটি ডিপোজিটের টাকা জোগাড় করতে অসমর্থ হন। সেই সময় তাঁর বন্ধু মতিলাল শীলের সহায়তায় তিনি দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। কালক্রমে রাম কমল সেন তৎকালীন হিন্দু কলেজের গভর্নিং বডি'র সদস্য হন। চিন্তাধারায় রক্ষণশীল হলেও বিভিন্ন সমাজমুখী কর্মকাণ্ডের তিনি অংশীদার ছিলেন।

রাম কমল সেনের পুত্র পেয়ারি মোহনও দেওয়ান পদে যোগ দেন। তাঁর মৃত্যুকালে তিন সন্তান নিতান্তই নাবালক ছিল। তাঁর স্ত্রী সারদা দেবী অনেক সংগ্রাম করে সন্তানদের মানুষ করেন। সেই সময়ের কথা তাঁর জামাতা জগেন্দ্র খাস্তগিরের অনুপ্রেরণায় 'সারাদা দেবীর আত্মকথা'য় লেখা আছে।

পেয়ারি মোহনের তিন সন্তান-নবীন চন্দ্র সেন, কেশব চন্দ্র সেন ও কৃষ্ণ বিহারী সেন।

আমার প্রপিতামহ ছিলেন কৃষ্ণ বিহারী সেন। তিনি সেই সময় ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি নিজের মেজদা কেশব সেনের একনিষ্ঠ গুণগ্রাহী ছিলেন। কেশব সেনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড তাঁর লেখনী গুণে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

রামমোহন রায় বৈদিক অনশাসন ও ব্রাহ্ম চিন্তাধারায় যে ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পরবর্তী কালে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর ও কেশব সেনের নানান জনহিতকর কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তা বিশাল বটবৃক্ষের মতো তৎকালীন সমাজে সংস্কারমুক্ত বিশুদ্ধ চিন্তাধারার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। কেশব সেনের ছোটো ভাই কৃষ্ণ বিহারী সেন তাঁর সকল কর্মকাণ্ড পত্রিকা মারফৎ জনগণের কাছে তুলে ধরেন। কাদম্বিনী গাঙ্গুলি, চন্দ্রাবতী বসু সকলেই ব্রাহ্ম সমাজেরই ফলশ্রুতি। কেশব সেন ইংরেজ শাসকের সহায়তায় ১৪ বছরের নীচে বালিকাদের বিবাহ এবং গৌরীদান প্রথা রদ করেন। এই কাজ তাঁকে সমাজ সংস্কারক হিসাবে মান্যতা দেয়।

কেশব সেনের এই সকল কাজ হিন্দু ধর্মকে সপাটে আঘাত করে। তাঁর দাদা নবীন চন্দ্র সেন তাঁকে ত্যাজ্য ঘোষণা করেন এবং সস্ত্রীক গৃহত্যাগে বাধ্য করেন। কেশব সেন সেই সময় কলুটোলার পিতৃগৃহ ত্যাগ করে তাঁর বন্ধু দেবেন্দ্র নাথের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আশ্রয় নেন। সে সময় রবীন্দ্রনাথ নিতান্তই শিশু। এর বছর খানেক পর কেশব সেন রাজাবাজারে তাঁর বাড়ি 'কমল কুটীরে' চলে যান। তাঁর ওই বাড়ি পরবর্তী কালে ভিক্টোরিয়া

কলেজ নামে পরিচিত হয়।

পরবর্তী কালে ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য পদের মনোনয়নকে ঘিরে দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের সঙ্গে কেশব সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখের মতবিরোধ শুরু হয়। দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর ছিলেন 'পিয়ালি ব্রাহ্মণ', ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কাউকে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য পদে স্বীকৃতি দিতে রাজি ছিলেন না। তাই কেশব চন্দ্র ও তাঁর অনুগামীরা ব্রাহ্ম সমাজ ত্যাগ করে বর্তমান কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রিটে 'নব বিধান ব্রাহ্ম সমাজ' স্থাপন করেন। তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল জন্ম পরিচয় নয়, জ্ঞানে, গরিমাই চারিত্রিক দৃঢ়তায়ে উন্নীত যে জন সেই হবে আচার্য পদের যোগ্য। এরপর নববিধানের সদস্য সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে।

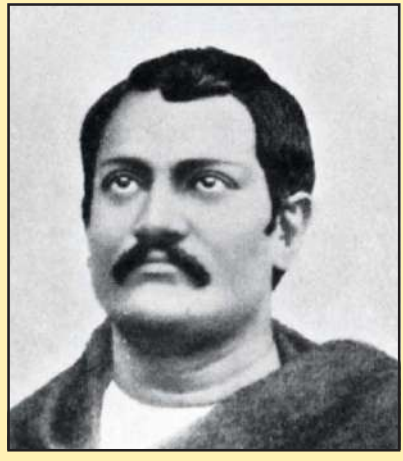

কেশব সেন ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচারের জন্য সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বক্তৃতা দেন। ব্রাহ্ম সমাজের বিভিন্ন গঠনমূলক কাজের বিশ্লেষণ করেন। নানা জনহিতকর কাজের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় জনমানসে এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিগণিত হন। ছাত্র অবস্থায় বিবেকানন্দা তাঁর ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হন। শঙ্করী প্রসাদ বসুর 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' বইতে এই বিষয়ে আলোচনা করা রয়েছে। কেশব সেনের কর্মকাণ্ড সুদূর ইংল্যান্ডেও ছড়িয়ে পড়ে। ব্রিটিশ মহারানি তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতা করার জন্য তাঁকে ইংল্যান্ডে আমন্ত্রণ জানান।

কেশব সেন যখন উন্নতির শিখর ছুঁয়েছেন সেই সময়ই তাঁর বন্ধু কোচবিহারের মহারাজা মারা যান। তাঁর নাবালক সন্তানকে ব্রিটিশ সরকার নিজ দায়িত্বে সুযোগ্য উত্তরাধিকার বানানোর প্রয়াস নেয়। তারা বিবাহ উপযোগী এমন একটি যোগ্য পাত্রীর সন্ধান করেন যে জ্ঞানে ও গরিমায় ব্রিটিশদের যোগ্য। সে সময় কেশব সেন তাঁর কন্যাদের মেম শিক্ষিকা দিয়ে আধুনিকভাবে শিক্ষিতকরছিলেন যাতে তাঁরা পিতার যোগ্য হয়ে ওঠেন। ব্রিটিশ সরকার ভুয়ো টেলিগ্রাম করে কেশব সেনকে সপরিবার কোচবিহারে নিয়ে যায় এবং তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা সুনীতি দেবীর সঙ্গে কোচবিহারের মহারাজার ছেলের বিবাহ দেন। সুনীতি দেবীর বয়স তখন ১২ কী ১৩ বছর। এই ঘটনায় নববিধান-এর সকল সদস্য কেশব সেনের ওপর ক্ষুব্ধ হন।

কেশব সেন নিজেও এই ছলনা সইতে পারছিলেন না। তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম ত্যাগ করে শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ' আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। কেশব সেনের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্যা কন্যা সুনীতি দেবী পিতার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যান। সুনীতি দেবী কলকাতার আলিপুরে ব্রিটিশ গভর্নর হাউজের আদলে রাজকীয় প্রাসাদ বানান। যা পরবর্তী কালে আলিপুর ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে পরিণত হয়।

প্রকৃত অর্থে সংস্কারমুক্ত, যুক্তিসঙ্গত, মুক্ত চিন্তাধারার যে স্রোত ভাগীরথের মতো রামমোহন বঙ্গ ভূমিতে নিয়ে এসেছিলেন তা পরবর্তীতে ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর, কেশব সেনের হাত ধরে পূর্ণ পরিণতি পায়।

ড্রামা থেরাপি নিয়ে কাজ করতে চান অভিনেত্রী অস্মিতা

মনস্তত্ত্ব নিয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট **অস্মিতা খাঁ** অভিনয় ও নির্দেশনায় নজর কেড়েছেন। নাট্যথেরাপি আর এই সময়ের নাটক নিয়ে নিজের কথা জানালেন **সৈকত হালদারকে**

মানুষের আচরণগত আর আবেগের সমস্যা মেটাতে প্রয়োগ করা হয় ড্রামা থেরাপি। ড্রামা আর সাইকোথেরাপির সমন্বয়ে এক বিশেষ পদ্ধতি হল ড্রামা থেরাপি। বিদেশে মানুষের জটিল সমস্যা সমাধানে মিউজিক থেরাপির মতো ড্রামা থেরাপির ব্যাপক চর্চা, প্রয়োগ ও গবেষণা হচ্ছে অনেক দিন ধরে। এই থেরাপি নিয়ে কাজ করতে চান বাংলা রঙ্গমঞ্চের এই প্রজন্মের অন্যতম সম্ভাবনাময় অভিনেত্রী ও নির্দেশক অস্মিতা খাঁ। তাঁর কথায়, ড্রামা থেরাপি এক গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি যা নাটকের মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়। যার মধ্যে রয়েছে ইমপ্রোভাইজেশন, রোল প্লেইং আর পাপেটের ব্যবহার। এই সৃজনশীল থেরাপি মানুষের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে ও সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে।

লেখাপড়ায় খুব মেধাবী অস্মিতা। স্কুলিং লরেটো হাউস থেকে। পরে লরেটো কলেজ থেকে সাইকোলজিতে অনার্স নিয়ে ডিগ্রি কোর্স পাস করেন। এ বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণির প্রথম হয়ে সাইকোলজিতে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স পাশ করেছেন।

মেধাবিনী অস্মিতা নাটকের জগতেও সমান উজ্জ্বল। নাটকের সঙ্গে তাঁর রক্তের সম্পর্ক। বাবা আশিসকুমার নাট্যসংগঠক ও বিডন স্ট্রিট শুভম দলের কর্ণধার। মাত্র ৩ বছর বয়সে অস্মিতা এই দলের প্রযোজনায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাহিনি নিয়ে 'ক্ষীরের পুতুল' নাটকে প্রথম অভিনয় করেন। ছোট্ট চরিত্রে অভিনয় করে নিজের প্রতিভার পরিচয় দেয়। শিশু শিল্পী হিসাবে অভিনয় করেন শ্যামল সরকারের নির্দেশনায় 'মরেছে প্যালগা' (কাহিনি সমরেশ বসু) আর 'স্পর্শ' নাটকে। শিশু নির্দেশক হিসাবে নির্দেশনা দেন 'সূক্ষ্ম বিচার' (কাহিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) ও 'পুতুলের বিয়ে' (কাহিনি শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)। টিনএজার অভিনেত্রী হিসাবে অভিনয় করেন শুভাশিস গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত 'যখন ডাকঘর আছে আমি নেই', 'কাজলরেখা', 'নটীর পুজো', সুমন্ত রায়ের নির্দেশনায় 'চণ্ডীচরণের গান', রাজা ভট্টাচার্যের 'অল ইজ ওয়েল', শ্যামল সরকারের 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' ও 'অথ শিক্ষা বিচিত্রা'তে। তাঁর নির্দেশিত ও অভিনীত নাটকের মধ্যে রয়েছে 'কী করে বুঝবো' (কাহিনি আশাপূর্ণা দেবী), 'নট ফর সেল' (কাহিনি কৌশিক চট্টোপাধ্যায়), 'হ য ব র ল' (কাহিনি সুকুমার রায়), ঘ্যাঁঘাসুর (কাহিনি উপেন্দ্রকিশোর

রায়চৌধুরী), 'সব চরিত্র কাল্পনিক'। তাঁর অভিনীত নাটক 'অল ইজ ওয়েল' নয়া দিল্লির স্কুল অফ ড্রামায় বাছাই হয় ও ২০১০ সালে নাট্যোৎসবে পরিবেশিত হয়। 'কী করে বুঝবো' নাটক ২০১২ সালে কলকাতার সপ্তর্ষি প্রকাশনী থেকে বই আকারে বেরোয় ও উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী ও নাট্যব্যক্তিত্ব ব্রাত্য বসু। 'নট ফর সেল' ২০১৬ সালে বালরঙ্গম থিয়েটার ফেস্টিভ্যালে বাছাই ও মঞ্চস্থ হয়। 'হ য ব র ল' ২০১৬ সালে বাছাই ও পরিবেশিত হয় শিশু কিশোর উৎসবের শিশু নাট্যোৎসবে আর কলকাতা নান্দীকার আয়োজিত ৩৩তম জাতীয় নাট্যোৎসবে। এই নাটক ২০১৭ সালে সম্প্রচারিত হয় দূরদর্শনের জাতীয় কার্যক্রমে। তাঁর অভিনীত 'ঘ্যাঁঘাসুর' ও 'সব চরিত্র কাল্পনিক' পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির নাট্যোৎসবে মঞ্চস্থ হয়। অস্মিতা তাঁর কাজের জন্য নানা পুরস্কার পেয়েছেন। ২০১১ সালে সেরা শিশুশিল্পী হিসাবে পান 'সুন্দরম পুরস্কার', ২০১৮ সালে রাজ্য সরকারের শিশু কিশোর আকাদেমি আয়োজিত কিংবদন্তি সুকুমার রায় স্মরণ ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মরণ বক্তৃতার জন্য পুরস্কার পান। ২০১৪ সালে ব্রিটিশ কাউন্সিল আয়োজিত জাতীয় আন্তঃস্কুল নাটক প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পান। তবে, পুরস্কারের চেয়ে তাঁর কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ দর্শকদের ভালোবাসা। অস্মিতার কাছে দর্শকরাই নাটকের গণদেবতা। 'নাটককে আরো বেশি করে দর্শকদের কাছে পৌঁছোতে হবে। তার জন্য নাটকের ভাবনা ও উপস্থাপনায় আনতে হবে মৌলিকতা আর বৈচিত্র্য। শুধু বিদেশি কাহিনিনির্ভর নাটক নয়, আমাদের সাহিত্যের অনেক সম্ভার রয়েছে। সেসব কাহিনি নিয়ে এই সময়ের প্রেক্ষাপটে নাটক করতে হবে' জানান অস্মিতা। অভিনেত্রী মনে করেন, আগামীদিনে ছোটো স্পেশে অন্তরঙ্গ নাট্যচর্চা আরো বাড়বে। অস্মিতা আরো জানান, এই প্রজন্ম ডিজিটাল মাধ্যমে নানা অস্বাস্থ্যকর বিনোদনে আসক্ত। তাঁদের ফিরিয়ে আনতে পারে নাট্য মাধ্যম। নাটকের রিয়েলিস্টিক বিষয় নিয়ে কাজ হয়। নাটক সমাজের ভালো-মন্দ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। এই মুহূর্তে অস্মিতা চূড়ান্ত ব্যস্ত নিজেদের নাটকের দল বিডন স্ট্রিট শুভম আয়োজিত ২০তম শুভম নাট্যমেলা নিয়ে। ৩ দিনের এই উৎসব হবে কলকাতার মিনার্ভা থিয়েটারে। উৎসব শুরু ২৯ ডিসেম্বর ও চলবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এখানে নিজেদের দলের প্রযোজনা ছাড়াও অন্য দলের নাটক মঞ্চস্থ হবে। ৩১ ডিসেম্বর তাঁর নির্দেশনায় মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'কালো ব্যাগ' নিয়ে হবে 'ক্যাপচার'। চলছে শেষ সময়ের মহড়া। অভিনেত্রী ও নির্দেশক অস্মিতা খাঁ যেমন নাটক নিয়ে নতুন নতুন কাজ করতে ও স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসেন, তেমনি দর্শকদেরও নাটক নিয়ে ভাবাতে আর স্বপ্ন দেখাতে চান।

মহাভারতের কথা অমৃতসমান

সময়ের অভাবে আমাদের মহাভারত পড়ার সুযোগ না থাকলেও এর মূল সূত্রগুলি আমাদের জীবনে খুবই কার্যকরী। যেমন,

● যদি আপনি সময় মতো বাচ্চাদের ভুল দাবি ও জেদ নিয়ন্ত্রণ না করেন তবে শেষ পর্যন্ত অসহায় হয়ে যাবেন। যেমন হয়েছিল কৌরবরা।

● আপনি যতই শক্তিশালী হন না কেন, অধর্মের পথে থাকলে আপনার জ্ঞান, অর্থ, শক্তি ও আশীর্বাদ সব ব্যর্থ হয়ে যাবে, যেমন হয়েছিল কর্ণের।

● বাচ্চাদের এতটাই উচ্চাভিলাষী করবেন না যে জ্ঞানের অপব্যবহার করে নিজেকেই ধ্বংস করে ও সবার অমঙ্গল করে। যেমন করেছিলেন অশ্বত্থামা।

● কখনও কাউকে এমন প্রতিশ্রুতি দেবেন না যাতে আপনাকে অন্যায়ের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়। যেমন করেছিলেন পিতামহ ভীষ্ম।

● সম্পত্তি, ক্ষমতা অপব্যবহার ও অপকর্মের ফলে আত্ম-ধ্বংস হয়। যেমন হয়েছিল দুর্যোধনের।

● ব্যক্তির ক্ষমতা ও অন্ধ পুত্রস্নেহ ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। যেমন হয়েছিল ধৃতরাষ্ট্রের।

● যদি ব্যক্তি জ্ঞানের দ্বারা অবদ্ধ থাকে তবে বিজয় অবশ্যই পাওয়া যায়। যেমন পেয়েছিলেন অর্জুন।

● আপনি সব কাজে কৌশল, জালিয়াতি ও ঠাট্টা তৈরি করে সবসময়ে সফল হতে পারবেন না, যেমন পারেনি শকুনি।

● আপনি যদি নীতি, ধর্ম ও কর্ম সফলভাবে অনুসরণ করেন তবে বিশ্বের কোনো শক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারে না, তার উদাহরণ যুধিষ্ঠির। ওপরের সূত্রগুলো থেকে শিক্ষা না নিলে আমার-আপনার জীবনেও কুরুক্ষেত্র ঘটে যেতে পারে।

অমৃত কথা -২

স্বামীজির জীবন্ত দুর্গাপুজো

১৯৮৮ সাল!

শিকাগো থেকে ফেরার পর বেশ কয়েকবছর কেটে গেছে। স্বামীজি বসে আছেন বেলুড় মঠের গঙ্গার তীরে। শীতের বিকেলের শেষ রোদ তখন গঙ্গার ঢেউয়ের বিভঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। স্বামীজির পাশে বসে আছেন তাঁর বিদেশিনী শিষ্যা ভগিনী

নিবেদিতা। নিস্তব্ধতা ভেঙে, জলদগম্ভীর কণ্ঠে স্বামীজি বলে উঠলেন, না, সিস্টার। এইভাবে বসে বসে সময় নষ্ট করা ঠিক হচ্ছে না!

সিস্টার : বলুন স্বামীজি কী করতে হবে?

স্বামীজি : সারা পৃথিবীকে আমি ভারতীয় দর্শন বোঝালাম। কিন্তু আমি নিজে কি আজও ভারত মাকে জানা বা চেনার চেষ্টা করেছি? ভাবছি পায়ে হেঁটে আমি ভারত মাকে দর্শন করব। তুমি কি পারবে আমার সঙ্গে যেতে? সিস্টার : এ তো আমার পরম সৌভাগ্য স্বামীজি! এই দেশটাকে আমি নিজের দেশ থেকে বেশি ভালোবাসি। তাই সব ছেড়ে চলে এসেছি। এই দেশকে চেনা ও জানার সৌভাগ্য আমি অর্জন করতে চাই। যত কষ্ট হোক, আমি আপনার সঙ্গে যাব স্বামীজি।

যেমন ভাবনা, তেমন কাজ। দক্ষিণের কন্যাকুমারিকা থেকে শুরু হল পায়ে হেঁটে ভারত দর্শন। গন্তব্য, উত্তরের কাশ্মীর উপত্যকা। টানা প্রায় ৬ মাস পথ চলে, অক্টোবরে স্বামীজি পৌঁছোলেন কাশ্মীর। ক্লান্ত, অবসন্ন শরীর তখন প্রায় চলছে না, একটু বিশ্রাম চাইছে। উপত্যকার একটা ফাঁকা মাঠের পাশে পাথরখণ্ডের ওপর বসে ক্ষণিক বিশ্রাম নিচ্ছেন স্বামীজি। সামনের মাঠে খেলা করছিল কিছু স্থানীয় শিশু কিশোর। বছর পাঁচেকের এক শিশুকন্যাও তাদের মধ্যে রয়েছে। ওই মেয়েটির দিকে একদৃষ্টি দেখছেন স্বামীজি। মেয়েটির মা, তাকে ডেকে একটা পাত্রে কিছু খাবার দিয়ে গেলেন। মেয়েটি খাবার সবেমাত্র মুখে তুলতে যাবে, এমন সময় দূর থেকে আরও ছোটো একটি ছেলে চিৎকার করে নিজের ভাষায় কিছু একটা বলতে বলতে মেয়েটার কাছে ছুটে এল। মেয়েটা নিজের মুখের খাবারটা রেখে দিল পাত্রের মধ্যে। খাবার সমেত পাত্রটা এগিয়ে দিল ছেলেটার দিকে। স্বামীজীও উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন। চিৎকার করে বলেন, সিস্টার আমি পেয়ে গেছি।

সিস্টার : কী পেলেন স্বামীজি?

স্বামীজি : মা দুর্গা পেয়ে গেছি। ভারত মাকে খুঁজে পেয়েছি। ওই দেখ সিস্টার! যে মেয়েটা নিজের মুখের খাবার, হাসতে হাসতে ভাইয়ের মুখে তুলে দিতে পারে, যুগ যুগ ধরে সেই তো আমার মা দুর্গা! সেই তো আমার ভারত মাতা!

স্বামীজি : সিস্টার, তুমি পুজোর উপকরণ সাজিয়ে ফেল। আগামী কাল দুর্গাপুজোর অষ্টমীতে এই মেয়েটাকে আমি ক্ষীর ভবানী মন্দিরে, দুর্গার আসনে বসিয়ে কুমারীপুজো করব। আমি যাচ্ছি মেয়েটার বাবার সঙ্গে কথা বলতে। আচমকা স্বামীজির পথ আটকান কিছু কুসংস্কারাচ্ছন্ন কাশ্মীরি পণ্ডিত।

স্বামীজি আপনি দাঁড়ান।

পণ্ডিতরা : স্বামীজি! আপনি না জেনে বুঝেই ভুল করতে যাচ্ছেন। ওই মেয়েটিকে আপনি কখনোই দুর্গা হিসাবে পুজো করতে পারেন না। ওর জন্ম মুসলমান ঘরে। ওর বাবা একজন মুসলমান শিকারা চালক। ও মুসলমানের মেয়ে। স্বামীজির কান দুটো লাল হয়ে গেছে। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে।

গম্ভীর গলায় স্বামীজি বলেন, আপনারা মা দুর্গাকে হিন্দু আর মুসলমানের পোশাক দিয়ে চেনেন! আমি আমার মা দুর্গাকে অন্তরাত্মা দিয়ে চিনি! ওই মেয়েটির শরীরে হিন্দুর পোশাক থাক বা মুসলমানের পোশাক, ওই আমার মা দুর্গা। আগামী কাল ওকে আমি দুর্গার আসনে বসিয়ে পুজো করব।

পরেরদিন সকাল। দুর্গাপুজোর অষ্টমী। ক্ষীর ভবানী মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে। শাঁখ বাজছে। মুসলমানের মেয়ে বসে আছে দুর্গা সেজে। পুজো করছেন হিন্দুর সন্তান স্বামী বিবেকানন্দ। পুজোর উপকরণ সাজিয়ে দিচ্ছেন, খ্রিস্টান ঘরে জন্ম নেওয়া ভগিনী নিবেদিতা। এই হল মহামানবের দুর্গাপুজো, এই হল মানবিকতার দুর্গাপুজো। মা আমাদের সবার। জাত, ধর্ম নির্বিশেষে সবার। মা'র কোনো জাত ধর্ম নেই, থাকে না।

হেমন্তের পরশ

ক্ষিতীশ বর্মণ

অরুণাভায় জাগিল ধরণী
চঞ্চল সমুজ্জ্বল,
কলকাকলিতে কুঞ্জ ভরিল
যত বিহঙ্গ দল।
পূর্ব গগনে উঠিল হেসে
নির্মল স্নিগ্ধ রবি,
দিগদিগন্ত উদয়ারুণে
উদ্ভাসিত নব ছবি।
তরণী সম মেঘ পুঞ্জ
সাজিয়াছে নানা রঙ্গে,
হেমন্তের সুশীতল পরশ
লাগিল ধরণী অঙ্গে।

অনু কবিতা

সুবিমল সরকার

(১)

আবেগ নারীকে করেনা বিবশ
পুরুষ তুমিই থাকো প্রেমে অবশ

(২)

মনের তো কোন বয়স নেই
তবু তুমি বয়স মানো
মরছি আমি প্রেমের জ্বালায়
সেটা তুমি ভালই জানো

(৩)

একবার দাও যদি আলিঙ্গন
ভেবো না হাতছাড়া হবে অঙ্গন।

(৪)

তোমার চোখের তারায় আছে বশীকরণ
সেখানে নিশ্চিত জানি আমার মরণ-

(৫)

পান করতাম অবশ্যই বিষ যদি পেতাম
তোমার অবহেলার চেয়ে সেটার কম দাম।

ইন্দ্রিতা

ইন্দ্রনীল ব্যানার্জি

স্বপ্নের আর এক নাম সময়।
সময়ের আর এক নাম ইচ্ছা।
ইচ্ছার আর এক নাম ধারাবাহিকতা।
কে যেন দিয়েছিল নাম তার ইন্দ্রিতা।
মনে রাখবে হয়তো ভবিষ্যৎ তাকে ইতিহাস বলে।
কিংবা থেকে যাবে সুদূর অতীতের কোলে।

শারীরিক

মানসকুমার ঠাকুর

হয়তো ছুঁয়েছিলে তুমি ওই নদীর শরীর
আমিও রেখেছি হাত কুমারীর জলে।
বুঝতে চেয়েছি শরীর কিভাবে
শরীরের সাথে কথা বলে।

হৃদয়ে ভাঙছে ঢেউ অবিরত,
পাখিটাও ডানা ভেঙে স্থির।
আমি এখনো খুঁজছি স্পর্শ তোমার,
কাঁসাই - কুমারীর সঙ্গম স্থলে।
বুঝতে চেয়েছি শরীর কিভাবে
শরীররের সাথে কথা বলে।

বৃত্ত

দেবাশিস দত্ত

একটি বৃত্ত আঁকতে গেলে
একটা কেন্দ্রবিন্দু লাগে
একটি শিশুর মননে, গঠনে
বাবা-মা-ই হলো সবার আগে।
বাবার শাসন হয়েছে যে ব্রাত্য
মায়ের স্নেহ খেয়েছে মাথা
দাঁতের মূল্য পারিনি বুঝতে
তাই অসময়ে হয়েছে দাঁতে ব্যথা।
কেন্দ্রবিন্দু ছাড়া সম্পূর্ণ করা
গেল না কোনো বৃত্ত
অতৃপ্ত থেকে গেল অনেক কিছু,
পূর্ণ হল না অভীষ্ট লক্ষ্য
ত্রিভুজ, রম্বস, শঙ্কু হয়েছে যে সব
এই সন্তুষ্টি নিয়েই প্রতিনিয়ত হতে হচ্ছে যে তৃপ্ত।

দুয়ারে স্বাস্থ্য প্রকল্প

জাতীয় এডস নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি

এই প্রকল্পের আওতায় বিনামূল্যে রোগীদের এইচআইভি ও এডস রোগের পরীক্ষা ও চিকিৎসা করা হয়। রোগীদের রক্তে এই ভাইরাস রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করতে পলিমারেজ চেন রিঅ্যাকশন পরীক্ষা করা হয়। তেমনই ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু ইত্যাদি রোগ নির্ধারণ পরীক্ষার জন্য রয়েছে পতঙ্গবাহী রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি। এই সব রোগের জন্য নিখরচায় সরকারি হাসপাতালে পরিষেবা মেলে। যোগাযোগ করতে হবে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, বিভিন্ন মহকুমা হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজে।

রাজ্য সরকারের কর্মীদের জন্য

সরকারি কর্মী বা সরকারি চাকরি থেকে অবসর প্রাপ্তদের পরিবার এই স্কিমের সুবিধা পাবেন। যে সব হাসপাতালকে এই প্রকল্পের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, সেখান থেকে চিকিৎসার খরচ ফেরৎ দেওয়া হয়। এছাড়া বিশেষ বিশেষ কিছু অসুখের ক্ষেত্রে আউটডোর চিকিৎসার জন্যও খরচ দেওয়া হয়। এই প্রকল্পে তালিকাভুক্ত রয়েছে ৯টি হাসপাতাল।

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের জন্য

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। এটা এক ধরনের গ্রুপ ইনসিওরেন্স। এক্ষেত্রে প্রথমে কিছু স্থায়ী টাকা মাসিক প্রিমিয়াম হিসাবে দিতে হয়। তারপর স্মার্ট কার্ডের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের হাসপাতালে চিকিৎসা করালে টাকা পাওয়া যায়। এছাড়া প্রাইভেট হাসপাতালে চিকিৎসা করালে সেক্ষেত্রেও টাকা পাওয়া যায়।

শ্রমিকদের জন্য প্রকল্প

এই প্রকল্পে সুবিধা পাবেন পরিবহণ কর্মী, হোটেল, রেস্টুরেন্ট, খবরের কাগজ, দোকান ও যেকোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্মীরা। উল্লেখিত সংস্থাগুলোয় অন্তত দশজনের বেশি কর্মী থাকলে এই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া যাবে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে যে সব সুবিধা মিলবে তা হল, স্মার্ট কার্ডের মাধ্যমে নিখরচায় ইএসআইসি ডিসপেনসারি, হাসপাতাল, ক্লিনিক ও স্কিমে নথিভুক্ত চিকিৎসকদের কাছে নিখরচায় চিকিৎসা করার সুযোগ। এছাড়া এই প্রকল্পের আওতায় থাকলে মিলবে মাতৃত্বকালীন সুবিধা, শ্রাদ্ধকালীন আর্থিক সাহায্য, শারীরিক অক্ষমতাজনিত সাহায্য আর মৃত্যুর পর পরিবারকে আর্থিক সাহায্য। যাঁদের মাসিক বেতন ২১ হাজার টাকার মধ্যে তাঁরাই শুধু এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন।

দুয়ারে সরকারি স্বাস্থ্য প্রকল্প

কোভিড-১৯ সম্পর্কিত দায়িত্বে যাঁরা, তাঁদের বিমা প্রকল্প

পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা দায়িত্বপ্রাপ্ত কোভিড সম্পর্কিত কাজের সঙ্গে জড়িত যে কোনো সরকারি বা বেসরকারি, স্থায়ী, অস্থায়ী কর্মী বা ঠিকা শ্রমিক বা তাঁর বাড়ির কেউ কোভিড আক্রান্ত হলে সরকারি হাসপাতালে বা সরকার অধিগৃহীত বেসরকারি হাসপাতালে পুরো নিখরচায় চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন। এছাড়াও জন পিছু অতিরিক্ত এক লাখ টাকার আর্থিক সাহায্য পাবেন। দুর্ভাগ্যবশত, আক্রান্ত ব্যক্তি বা পরিবারের কোনো সদস্য কোভিডে মারা গেলে ১০ লাখ টাকার আর্থিক সাহায্য পাবেন। রাজ্য সরকার স্বীকৃত সাংবাদিকরাও এই বিশেষ বিমা প্রকল্পের আওতায় রয়েছেন। এ সম্পর্কে জানতে লগ অন করতে পারেন-

মিশন ইন্দ্রধনুশ

দারিদ্রসীমার নীচে থাকা গর্ভবতী মহিলা ও শিশু নিখরচায় যে কোনো সরকারি হাসপাতাল থেকে সব ভ্যাকসিন বা টিকা নিতে পারবেন। যে কোনো অ্যানড্রয়েড ফোনে 'ইন্দ্রধনুশ' নামে অ্যাপ রয়েছে। এখান থেকে টিকাকরণের সব খবর সময়মতো পাওয়া যায়। এই ধরনের স্কিমের ব্যাপারে বিশদে জানতে কাছাকাছি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, আশা কর্মী ও সরকারি হাসপাতালে যোগাযোগ করতে হবে।

চিফ মিনিস্টার রিলিফ ফান্ড

শুধুমাত্র এই রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দারা এই ফান্ডের সুবিধা পেতে পারেন। এক্ষেত্রে প্রথমে সাদা পাতায় আবেদন করতে হবে। যে রোগের জন্য চিকিৎসা করাতে রোগীর ফান্ডের দরকার সেই রোগের সব নথি ও রোগীর ইনকাম সার্টিফিকেট দিতে হবে। সঙ্গে সাংসদ বা বিধায়কের সুপারিশ করা চিঠি দিতে হবে। এই সব নথির জেরক্স কপিতে কোনো গেজেটেড অফিসার দ্বারা প্রত্যয়িত করাতে হবে। এরপর সব নথি নবান্নে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারির দফতরে জমা দিতে হবে। এককালীন টাকা দিয়ে রোগীর পরিবারকে সাহায্য করা হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াও হার্টের কোনো জটিল অপারেশন, বোন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্ট, কিডনি বদল ও ক্যানসার অসুখের চিকিৎসার জন্য আবেদন করতে পারেন।

জননী সুরক্ষা যোজনা

সামাজিক বা আর্থিকদিক থেকে পিছিয়ে পড়া পরিবারের গর্ভবতী মহিলা, তার সদ্যোজাত সন্তান ও ৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশু এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে পারে। এর মাধ্যমে সরকারি ও নথিভুক্ত বেসরকারি হাসপাতাল থেকেও নিখরচায় চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া যায়।

রানি ভবশঙ্করী উপাখ্যান

তনুশ্রী চক্রবর্তী

ষোলোশো শতকের কথা। ভুরিশ্রেষ্ঠ-- পূর্ব ভারতে বাংলার বুকে সবচেয়ে বড়ো হিন্দু শক্তির উত্থান। এই রাজ্যের অধিবাসীদের ভুরিশ্রেষ্ঠী বলা হত। এরা ছিল মূলত, বণিক। আইন-ই-আকবরী থেকে জানা যায়, ভুরসুট পরগনা থেকে প্রচুর রাজস্ব আদায়ের কথা। আরও জানা গেছে, এখানে তিনটি দুর্গ ছিল-ভবানীপুর, পাণ্ডুয়া বা পেড়ারে ও রাজবলহাট। পেড়ারে এক মহাকীর্তিধারী বীর রমণীর মহাবিক্রমের ইতিহাস আজ আমরা তুলে ধরব। যার উপস্থিতিতে বাঘে মানুষে একঘাটে জল খেয়েছে। রানি ভবশঙ্করী মুসলমান শাসকদের কাছে ছিলেন এক আতঙ্কিত নাম। তাঁকে কোনদিন পরাজিত করতে পারেননি সুলতান শাসকরা। পরাজিত করতে পারেননি পাঠান শাসকরা। পেড়ারে দুর্গের রক্ষক এবং দুর্গের প্রশিক্ষক ছিলেন ভবশঙ্করীর পিতা দীননাথ চৌধুরী। পিতার কাছ থেকেই তিনি যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। সেইসঙ্গে তীর ছোড়া, তরবারি চালনা, ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করা এইসব বিদ্যাতেও তাঁর বিশেষ নজির গড়ে তুলতে সক্ষম হন। পাশাপাশি শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের কাছে তিনি শিক্ষা নেন ধর্ম, রাজনীতি, দর্শন, কূটনীতির মতো প্রভৃতি বিষয়ে।

ভবশঙ্করীর মায়ের অকালমৃত্যুতে পিতা দীননাথ চৌধুরী কন্যাকে পাত্রস্থ করতে মনস্থ করেন। চলে উপযুক্ত পাত্রের খোঁজ। স্বাধীনচেতা ভবশঙ্করীর এক শর্ত ছিল। যে তাঁকে তরোয়াল যুদ্ধে পরাজিত করবে তিনি তাকে পাত্র হিসেবে গ্রহণ করবেন। এখানে একটা গল্প আছে, যা আজও হাওড়া, হুগলির মাঠেঘাটে প্রচলিত। একবার ভবশঙ্করী বুনো মহিষ শিকার করতে যান। বুনো মহিষ ভবশঙ্করীকে আক্রমণ করে। ভবশঙ্করী তরোয়াল দিয়ে সব ক'টি মহিষকে হত্যা করে সঙ্গীসাথীদের রক্ষা করেন। অদূরে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন স্বয়ং রাজা রুদ্রনারায়ণ। ভবশঙ্করীর ক্ষমতাকে সম্মান জানিয়ে দীননাথ চৌধুরীর কাছে তিনি খবর পাঠান। দীননাথকে রাজা জানান, তিনি ভবশঙ্করীর পারদর্শীতা দেখে মুগ্ধ। তাঁকে বিবাহ করতে ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। এই বিবাহের পর ভবশঙ্করী রানি ভবশঙ্করী নামে পরিচিত হন। বিবাহের পর তিনি শাসনকার্যে রুদ্রনারায়ণকে সাহায্য করতে থাকেন। সাম্রাজ্যের সুরক্ষার জন্য নির্মাণ করেন বেশ কয়েকটি দুর্গ। খানাকুল, তমলুক, আমতা, উলুবেড়িয়া প্রভৃতি স্থানে দুর্গ তৈরি হয়। ভুরিশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যে তিনিই প্রথম মহিলা সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। তিনিই প্রথম নিয়ম করেন প্রতিটি পরিবার

থেকে একজন করে সদস্যকে যুদ্ধ প্রশিক্ষণ নেওয়া বাধ্যতামূলক। যাতে প্রয়োজনের সময় সেনা নিযুক্ত থাকে। এই ধারণা তাঁকে শাসনকার্যে বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে নিতে সাহায্য করে। সে কারণে তাঁর সাম্রাজ্য পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, বর্ধমানের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃতি লাভ করে। হাওড়া, হুগলির পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া দামাদের নদ ও রণ নদীকে ব্যবহার করা হত ব্যবসা বাণিজ্যের কাজে। জলপথে যুদ্ধের জন্য গড়ে তোলেন বিশাল নৌবাহিনী।

রাজ্য পরিচিতি পায় রাজার কীর্তিতে। ষোড়োশো শতাব্দীর মধ্যভাগে গৌরের সুলতান সুলেমান কাররানি। একই সময়ে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়লাভ করে আকবর তখন দিল্লীর সম্রাট। মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তৃত বাংলা অবধি। চিন্তার ব্যাপার হল বাংলার সুলতান এবং পাঠান শাসকের কাছে। পাঠানদের সঙ্গে ওড়িশার রাজা মুকুন্দদেবের যুদ্ধ বাধে। সে আতঙ্কে রাজ্যবাসী তটস্থ। এইরকম পরিস্থিতিতেও রুদ্রনারাযণ অবিচল। সুরক্ষিত তাঁর সাম্রাজ্য। তিনি নিজের সাম্রাজ্যকে রেখেছেন কঠিন ঘেরাটোপের মধ্যে। রাজারানির উদ্যোগে এই সময় ভুরসুট রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠে বিভিন্ন দেবদেবীর মন্দির। এমন সময়ে হঠাৎ রাজার মৃত্যুতে সাম্রাজ্যের বুকে নেমে আসে কঠিন সময়। শাসনকার্য পরিচালনা করার জন্য রানি শক্ত হাতে সব ভার তুলে নিলেন। প্রতিরক্ষার দায়িত্ব দিলেন এক ব্রাহ্মণের হাতে। যাঁর নাম চতুর্ভুজ চক্রবর্তী। তিনি রাজসিংহাসন দখলের উদ্দেশ্যে ওসমানের সঙ্গে যুক্তি করে রানির ওপর আক্রমণ করার ফন্দি আঁটলেন। রানি তখন ছিলেন কাঠস্যাকরার মন্দিরে। ওসমান খবর পেয়ে রাতের অন্ধকারে আক্রমণ করলেন। কিন্তু যে নারীবাহিনী রানিকে সুরক্ষিত করে রেখেছিল তাদের সম্পর্কে ওসমানের বিন্দুমাত্র ধারণা না থাকায় ওসমানের সৈন্যরা বেশিরভাগ প্রাণ হারায় এবং কিছু অংশ ভয়ে পালিয়ে যায়। রানি চতুর্ভুজ চক্রবর্তীকে বরখাস্ত করে পেড়ার দুর্গের দায়িত্ব দিলেন ভূপতি কৃষ্ণের হাতে। এরপর কুল পুরোহিতের নির্দেশে বাঁশুরি মন্দিরে রানির অভিষেকের দিন স্থির হল। ওসমানের কাছে সে খবর যেতেই তিনি পাঁচশো সৈন্য নিয়ে রানিকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু রাজ্যের গুপ্তচরের তৎপরতায় রানি যুদ্ধের জন্য তৈরি হলেন। যুদ্ধ শুরু হল বাঁশুরির মন্দিরের কাছে। সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করলেন ভবশঙ্করী। যুদ্ধ জয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা থেকে পাঠান বাহিনী নিশ্চিহ্ন হল। রানির বীরত্বের কথা গিয়ে পৌঁছল সম্রাট আকবরের কাছে। তিনি রানির সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। এই সময় এই কাজটি সম্পাদনের জন্য আকবর রাজা মানসিংহকে রানির দরবারে প্রেরণ করেন। এই সূত্র ধরেই আকবর রানিকে রায়বাঘিনী উপাধিতে ভূষিত করেন। প্রজাহিতকারী রানি ভবশঙ্করী আদর্শ মেনে রাজত্ব করেছেন যতদিন না পর্যন্ত তাঁর পুত্র প্রতাপনারায়ণ উপযুক্ত হয়ে ওঠেন। পুত্র উপযুক্ত হয়ে উঠলে তিনি রাজ্যের ভার পুরোপুরিভাবে পুত্রের হাতে ন্যস্ত করে ধর্মে মতি দেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত গড় ভবানীপুরে গোপীনাথ জিউয়ের মন্দিরটি ভগ্নাবস্থায় এখনও

বর্তমান। এই মহীয়সী নারীর প্রতি আমরা সম্মান প্রদর্শন করি। ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল এই নারী শুধু বাংলা নয় সমগ্র বিশ্বের কাছে সম্মানীয়, যা এককথায় নজিরবিহীন। নিঃশব্দে যিনি পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে গেছেন মাতৃভূমিকে ভালবেসে। বিবর্তনের কালচক্রে যা বিস্মৃতির অতলগর্ভে তলিয়ে গেছে। এই রকম এক আদর্শ নারীর প্রতি সম্মান জানিয়ে প্রত্যেকেই সম্মানিত হই।

যুবদের সংকটে দিশারি

৪ পাতার পর

সাহায্য করে না, তা খুব বেদনার বিষয়। তিনি শিক্ষাকে মহান চিন্তার সমষ্টি মনে করতেন। তাই জোর দেন 'ম্যান মেকিং এডুকেশন'য়ে, মানুষ গড়ার শিক্ষায়। তিনি বলেন, যুবসমাজকে নিজের ওপর বিশ্বাস রেখে অবিশ্বাসকে দূর করে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। তাঁর মতে, 'আত্মবিশ্বাসী হও, অন্যথায় উন্নতি সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে তাঁর অমর বাণী, 'বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস নিজের ওপর বিশ্বাস- ঈশ্বরের বিশ্বাস-ইহাই উন্নতিলাভের একমাত্র উপায়। যদি তোমার পুরাণের তেত্রিশ কোটি দেবতার ও বৈদেশিকের মধ্যে যে সকল দেবতারা আমদানি করিয়াছে, তাহার সবগুলিতেই বিশ্বাস থাকে, অথচ যদি তোমার আত্মবিশ্বাস না থাকে, তবে তোমার কখনই মুক্তি হইবে না'। তিনি বলেন, 'কখনও ভাবিও না, আত্মার পক্ষে কিছু অসম্ভব। এরূপ বলা ভয়ানক নাস্তিকতা। যদি পাপ বলিয়া কিছু থাকে, তবে আমি দুর্বল বা ওরা দুর্বল-এরূপ বলাই একমাত্র পাপ'।

স্বামীজি ভারতের পুনর্গঠনে যুবার প্রাণশক্তিতে ভরসা রেখে তাঁদের এগিয়ে আসার কথা বলেন, 'ধৈর্য্যবান, বুদ্ধিবান, সর্বত্যাগী এবং আত্মানুবর্তি যুবকগণের ওপর আমার ভবিষ্যৎ ভরসা'। তিনি বলেন, 'ভাব ও সংকল্প যাহাতে কার্যে পরিণত হয়, তাহার চেষ্টা কর, হে বীরহৃদয় মহান বালকগণ! উঠে পড়ে লাগ! নাম, যশ বা অন্য কোনো তুচ্ছ জিনিসের জন্য পশ্চাতে চাহিও না। স্বার্থকে একেবারে বিসর্জন দাও ও কাজ কর'। তাঁর কথায়, 'আমার আইডিয়াগুলি ওয়ার্কআউট (কাজে পরিণত) করে নিজেদেরও দেশের কল্যাণে উন্নতি করতে পারবে'।

স্বামীজির বাণী

- 'দুনিয়া আপনার সম্বন্ধে কী ভাবছে সেটা তাদের ভাবতে দিন। আপনি আপনার লক্ষ্যগুলিতে দৃঢ় থাকুন, দুনিয়া আপনার একদিন পায়ের সম্মুখে হবে।'
- 'সেবা করো তাৎপরতার সঙ্গে। দান কর নির্লিপ্তভাবে। ভালোবাসো নিঃস্বার্থভাবে। ব্যয় কর বিবেচনার সঙ্গে। তর্ক কর যুক্তির সঙ্গে। কথা বল সংক্ষেপে।'
- 'যতক্ষণ না আপনি নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখবেন, ততক্ষণ আপনি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করবেন না।'
- 'যে রকম বীজ আমরা বুনি, সে রকমই ফসল আমরা পাই। আমরাই নিজেদের ভাগ্য তৈরি করি, তার জন্য কাউকে দোষারোপ করার কিছু নেই, কাউকে প্রশংসা করারও কিছু নেই।'
- 'সব শক্তিই আপনার মধ্যে আছে সেটার উপর বিশ্বাস রাখুন, এটা বিশ্বাস করবেন না যে আপনি দুর্বল। দাঁড়ানো এবং আপনার মধ্যেকার দৈবত্বকে চিনতে শিখুন।'
- 'আর কিছুরই দরকার নেই। দরকার শুধু প্রেম, ভালোবাসা ও সহিষ্ণুতা। জীবনের অর্থ বিস্তার আর বিস্তার ও প্রেম একই কথা। সুতরাং প্রেমই জীবন, এটাই জীবনের একমাত্র গতি।'
- 'উঁচুতে উঠতে হলে তোমার ভেতরের অহংকারকে বাহিরে টেনে বের করে আনো এবং হালকা হও কারণ তারাই ওপরে উঠতে পারে যারা হালকা হয়।'
- 'অন্যে যাই ভাবুক আর করুক, তুমি কখনও তোমার পবিত্রতা, নৈতিকতা আর ভগবৎপ্রেমের আদর্শকে নিচু কর না। ...যে ভগবানকে ভালবাসে তার পক্ষে চালাকিতে ভীত হবার কিছু নেই। স্বর্গে ও মর্তে পবিত্রতাই সবচেয়ে মহৎ ও দিব্য শক্তি।'

এফআইআর কখন, কীভাবে করতে হয়

আইনের বিষয়ে ঠিকঠাক জ্ঞান না থাকার জন্য আমরা অনেক ক্ষেত্রেই সুশাসন থেকে বঞ্চিত হই। অপরাধীরা অপরাধ করে পার পেয়ে যায়। এই বিভাগে আইনের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এফআইআর নিয়ে আলোচনা করা হল।

এফআইআর কী?

অপরাধ ও সে বিষয়ে কোনো কাজ হওয়ার পর তার প্রতিকার আর আইনি সাহায্য পাওয়ার জন্য স্থানীয় থানায় যে সংবাদ বা অভিযোগ দায়ের করা হয় তাকে এফআইআর বলে। এর পুরো কথা হল ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট। কোনো মামলা করতে হলে এফআইআর-এর মাধ্যমে তা করতে হয়।

এফআইআর কারা করতে পারেন?

যার বিরুদ্ধে অপরাধ হয়েছে তিনি বা তাঁর পক্ষে ওই অপরাধ যিনি সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছেন সেই ব্যক্তিও থানায় এফআইআর করতে পারেন। তদন্ত করার পর আমলযোগ্য কোনো অপরাধ হলে সাক্ষ্য প্রমাণের জন্য তদন্তকারী আধিকারিক অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ ও যাবতীয় ব্যবস্থা নেন।

কীভাবে এফআইআর করবেন

এফআইআর দু'ভাবে করা যায়। লিখিত ও মৌখিকভাবে। অপরাধ কোথায়, কখন হয়েছে, কীভাবে হয়েছে, অপরাধীর নাম, ঠিকানা, অপরাধের বিবরণ, অপরাধ হওয়ার আগের মুহূর্তের বিবরণ, এফআইআর যিনি করবেন তাঁর নাম-ঠিকানা এই সব তথ্য এফআইআর'য়ে দিতে হয়।

মৌখিক এফআইআর দায়ের করলে থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক তা লিখবেন ও পড়ে শুনিয়ে দেবেন। এফআইআর করতে কোনোভাবে দেরি করা যাবে না। খুব তাড়াতাড়ি এফআইআর করলে মামলার তথ্য প্রমাণ ঠিক থাকে।

থানা এফআইআর নিতে না চাইলে কী করণীয়

থানায় এফআইআর দায়ের করতে গেলে পুলিশ তা নিতে বাধ্য। এটা ভারতীয় আইনের ১৫৪ এর ১ উপধারায় বলা আছে। পুলিশ বা থানার আধিকারিক যদি এফআইআর না নেন, তাহলে সরাসরি পুলিশ সুপার বা পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ দায়ের করা যায়।

ফৌজদারি ধারা মতে এফআইআর-এর ব্যাখ্যা

ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫৬ ধারা মতে, এফআইআর করার পর যদি ওই অপরাধ বা ঘটনাটি এমন বিষয় সংক্রান্ত হয় যে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো পদক্ষেপ নিলে অভিযুক্তদের বা অপরাদীদের ধরা যাবে সেক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়াই তদন্ত করা যাবে।

১৫৫ ধারা মতে, এফআইআর-এর লিখিত অভিযোগটি আমলযোগ্য না হলে সেক্ষেত্রে পুলিশ এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দায়ের করবে ও এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুমতি চাইতে পারে। ম্যাজিস্ট্রেট প্রতিবেদন দেখে অনুমতি দিলে পুলিশ তদন্ত শুরু করতে পারবে। অনুমতি পাওয়ার পর তদন্ত অফিসার ১৫৫ ও ১৫৬ ধারায় যে নিয়ম বলা আছে তা অনুসরণ করবেন। যেমন- ১. ঘটনাস্থলে যাওয়া ২. এফআইআর-এর ঘটনা সম্পর্কে জানা ৩. অভিযুক্তদের খুঁজে বার করা ৪. অপরাধ সম্পর্কে দরকারি সাক্ষ্য ও প্রমাণ গ্রহণ করা ৫. ১৭৩ ধারা অনুযায়ী একটি চার্জশিট গঠন করা।

নিজের সঙ্গে সময় কাটানোর জায়গা

হ্যামার

পার্কস্ট্রিট থেকে পুরো শহরটা দেখতে চাইলে আপনাকে আসতে হবে 'হ্যামার'-এ। খোলা আকাশের নীচে বসে, কলকাতার স্কাইলাইন দেখার মজা উপভোগ করতে পারবেন এখানে। সঙ্গী হিসেবে পাবেন নানা স্বাদের খাবার। এই রেস্তরাঁর ভেতরের সাজ যাকে বলে 'ইনস্টাগ্রামেবল'। তাই দুপুর থেকে রাত সবসময়ে ছবি তোলার ভিড় লেগেই থাকে।

একেবারে পকেট ফ্রেন্ডলি এই রেস্তরাঁয় একটা পিৎজা বা কাবাব অর্ডার করে কাটিয়ে দিতে পারেন অনেকক্ষণ। সঙ্গে কোনো মকটেল অর্ডার করলে তো লা-জবাব। ককটেল ও হুক্কাও রয়েছে মেনুতে। রেস্তরাঁটি এখন খোলা পাবেন বেলা এগারোটা থেকে রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত। দু'জনের খেতে খরচ পড়বে ৭০০ টাকার মতো। এছাড়া যোগ হবে অতিরিক্ত কর। ভালো সঙ্গী না পেলে একাই চলে আসুন হ্যামার'য়ে। নিজের সঙ্গে সময় কাটানোর আদর্শ রেস্তরাঁ। সারাদিন কাজ করার পরিকল্পনা থাকলে ল্যাপটপ নিয়েও চলে আসতে পারেন। খাবার আর খোলা আকাশকে সঙ্গে নিয়ে সেরে ফেলতে পারেন অফিসের একঘেয়ে কাজ। এখানে এক-একদিন এক-এক রকমের খাবার পাবেন।

বিদেশি মুখরোচক স্ন্যাক্সে মন ও পেট ভরান

রেসিপি জানাচ্ছেন নীলাঞ্জনা পাহাড়ি

উপকরণ

চাইনিজ ফ্রাইড ভেজিটেবল

উপকরণ :

পেঁয়াজ সহ ২টি পেঁয়াজপাতা, কুঁচোনো পেঁয়াজ আধ কাপ। বাঁধাকপি ঝুরি করে কাটা ১ কাপ, গাজর ঝুরি করে কাটা আধ কাপ। ১টি ক্যাপসিকাম, ১টি টমেটো টুকরো করে কাটা। বেবিকর্ন টুকরো আধকাপ। ফিশসস চা চামচের ৮ ভাগের ১ ভাগ। সয়াসস ২ টেবিল চামচ। আদার রস ১ চা চামচ। রসুন বাটা ও আদা বাটা ১ চা চামচ। কাঁচালঙ্কা বাটা, ভিনিগার, তেল চা চামচের ৪ ভাগের ১ ভাগ।

কীভাবে করবেন : বড়ো কড়াইয়ে তেল গরম করে পেঁয়াজ, সবজি, বেকিং পাউডার দিয়ে ২ থেকে ৩ মিনিট নাড়াচাড়া করুন। সয়াসস, আদার রস, রসুন, কাঁচালঙ্কা বাটা ও ভিনিগার দিয়ে নেড়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নামান। গরম গরম পরিবেশন করুন।

সিজউইন স্রিম্প

উপকরণ : আধকেজি চিংড়ি, শুকনো লঙ্কা ৪টি, কচি পেঁয়াজ ১০টি, তেল ৪ ভাগের ১ কাপ, টমেটো সস ২ টেবিল চামচ, অর্ধেক ক্যাপসিকাম টুকরো, সয়াসস দেড় টেবিল চামচ, মিহি করে আদা কুচি ১ টেবিল চামচ, রসুন কুচি ২ টেবিল

এরপর ২৯ পাতায়

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের খনি জলদাপাড়া অভয়ারণ্য

ডুয়ার্স বলতে প্রথমেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের

ছবি। অনবদ্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের খনি ডুয়ার্স অঞ্চলে রয়েছে একাধিক অরণ্য। সেখানে সবুজের জমজমাট রাজ্যপাট দেখে মন ভরে যায়। ডুয়ার্সের সব ক'টি অভয়ারণ্যের মধ্যে জলদাপাড়া ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি সবচেয়ে সুন্দর। জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের গেটওয়ে হল মাদারিহাট। শিলিগুড়ি থেকে দূরত্ব প্রায় ১৪০ কিলোমিটার। অরণ্য-ঘেঁষা মাঝারি মাপের জনপদ এটি। এই অভয়ারণ্য ভারতীয় এক শৃঙ্গ গণ্ডারের জন্য বিখ্যাত। পূর্ব হিমালয়ের ভুটান পাহাড়ের গা-ছোঁয়া এই অভয়ারণ্যে হাতি, লেপার্ড, গাউর সহ নানা ধরনের হরিণের দেখা মেলে। এছাড়াও রয়েছে শতাধিক প্রজাতির পাখি। প্রায় ২১৬ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তোর্সা, হলং-কালিঝোরার মতো নদী। জঙ্গলের প্রবেশদ্বার বন্ধ থাকে বর্ষার সময়। সময়টা ১৫ জুন থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর। জঙ্গলের গভীরে ঘোরার জন্য এলিফ্যান্ট রাইড ও মারুতি জিপসিতে চড়ে সাফারির ব্যবস্থা রয়েছে। এলিফ্যান্ট রাইডের সময় সকাল ৬টা ও ৭টা। গাড়িতে ঘোরানো হয় সকাল ৯টা ও বিকেল ৩টের সময়। গাড়িতে সময়

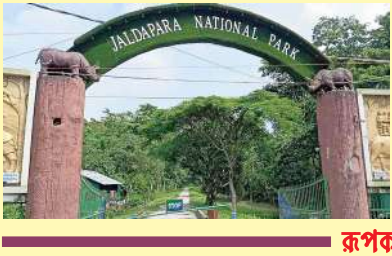

লাগে ১২০ মিনিট। যে পর্যটকরা হলং বনবাংলো কিংবা মাদারিহাট জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজে থাকবেন শুধুমাত্র তাঁরাই জঙ্গল সাফারি ও এলিফ্যান্ট রাইডের সুযোগ পাবেন। যাঁরা দিনে-দিনে এই অরণ্যে বেড়াতে চান তাঁরা মাদারিহাট থেকে অরণ্যের মধ্যে ৮ কিমি দূরে হলং বনবাংলো পর্যন্ত যেতে 'ডে-ভিজিটের' সুযোগ পাবেন সকাল ৯টা থেকে বেলা ৩টে পর্যন্ত। তাই জলদাপাড়া অভয়রাণ্য ভালোভাবে উপভোগ করতে হলে অবশ্যই এখানে রাত কাটাতে হবে। আর সিজনে বেড়াতে চাইলে বুকিং করতে হবে। জলদাপাড়া টুরিস্ট লজের সামনে রয়েছে বনবিভাগের ওয়াইল্ড

লাইফ রেসকিউ সেন্টার। এখানে খাঁচার মধ্যে রয়েছে চিতাবাঘ। এই ট্যুরিস্ট লজ থেকে কাছেপিঠের বেড়ানোর জায়গাগুলোর মধ্যে রয়েছে বক্সা, জয়ন্তী, বনবাংলো, টোটোপাড়া।

কীভাবে যাবেন :

শিলিগুড়ি তেনজিং নোরগে বাস স্ট্যান্ড থেকে ৩০ মিনিট বাদে বাদে আলিপুরদুয়ারের বাস ছাড়ে। এই বাস মাদারিহাট হয়ে যায়। বাস স্ট্যান্ড থেকে রিকশা নিয়ে চলে আসুন জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজে। এটা পশ্চিমবঙ্গ পর্যটনের অধীনে। কলকাতায় অগ্রিম বুকিং হয় এই ঠিকানায়— ট্যুরিজম সেন্টার, ৩/২ বিবাদি বাগ (পূর্ব) কলকাতা-১।

হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা

বাংলায় প্রাণের জায়গা

শান্তিনিকেতন

অলকানন্দা রায়, নৃত্যশিল্পী

নাচের সূত্রে দেশের নানা প্রান্তে, এমনকী বিদেশেও যেতে হয়েছে। সে সূত্রে বেড়ানোও হয়েছে। বাংলার মধ্যে প্রিয় জায়গা বলতে গেলে আমি শান্তিনিকেতনকে বেছে নেব। প্রিয় জায়গা বলার চেয়ে বলা ভালো প্রাণের জায়গা। এখানে কবিগুরুর ছোঁয়া তো আছেই। তার চেয়েও বাড়তি পাওনা আশেপাশের প্রকৃতি। একটু দূরে বয়ে চলেছে নদী। আদিবাসী গ্রামে সুযোগ পেলেই চলে যাই। সহজ, সরল আদিবাসীদের মুখগুলো বড্ড টানে। কেমন যেন নস্টালজিক হয়ে পড়ি। এতবার গেছি, তবু পুরোনো হয় না। বার বার নতুন করে আবিষ্কার করি আমার শান্তিনিকেতনকে।

হেঁসেল ২৭ পাতার পর

চামচ, চিনি ২ টেবিল চামচ, লবণ দরকার মতো।

কীভাবে করবেন : চিংড়ির মাথা বাদ দিয়ে খোসা ছাড়ান। ধুয়ে রাখুন। শুকনো লঙ্কা ৪ ফালি করুন। পেঁয়াজপাতা-সহ পেঁয়াজ নিন। পাতা অল্প লম্বা করে টুকরো করুন। কচি পেঁয়াজ লম্বায় ২ টুকরো করুন। কড়াইতে তেল গরম করে চিংড়ি দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। চিংড়ি কুঁকড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুকনো লঙ্কা, টমেটো সস, আদাকুচি, রসুন, চিনি ও লবণ দিয়ে নেড়ে নিন। এবার এমন আন্দাজে জল দিন যেন জল ২ মিনিট পরে টেনে যায় এবং চিংড়ি মাখা মাখা হয়। সয়াসস, ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ ও পেঁয়াজপাতা দিয়ে নেড়ে ৩ থেকে ৪ মিনিট ধরে রান্না করুন ও গরম গরম পরিবেশন করুন।

রানিমা ইমেজ থেকে বেরিয়ে এসে অন্য চরিত্রে কাজ করতে চাই : দিতিপ্রিয়া রায়

রানিমা। এই একটা নামই পরিচয়ের জন্য যথেষ্ট। বাংলা টেলি সিরিয়ালের জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'করুণাময়ী রানি রাসমণি'র রানিমা ওরফে দিতিপ্রিয়া রায় জনপ্রিয়তার নিরিখে ও অভিনয় দক্ষতায় বাংলার অন্যতম সেরা মুখ। সিরিয়ালে তার চরিত্রটি শেষ হয়ে গেলেও দর্শকদের মনে দিতিপ্রিয়া একটা রেশ ছেড়ে গেছে। এরইমধ্যে সে বলিউডেও ছবির কাজ করেছে। এর আগেও অবশ্য বেশ কয়েকটি বাংলা সিরিয়ালে তাকে দেখা গেছে। সামনেই তার ঝুলিতে কয়েকটি বাংলা সিনেমাও রয়েছে। কলেজে পড়াশোনার ফাঁকে অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছে সমানতালে। দিতিপ্রিয়া তার আগামী দিনের কাজ, পড়াশোনা, কেরিয়ার সবকিছু নিয়ে ভীষণভাবে অকপট।

প্র: শুটিং আর পড়াশোনা, দুটো একসঙ্গে সামলাচ্ছো। এরপর পড়াশোনার ব্যাপারে কী ভাবছো?

দিতিপ্রিয়া : উচ্চমাধ্যমিকে ভালো নম্বর নিয়ে পাশ করার পর সমাজতত্ত্ব নিয়ে আশুতোষ কলেজ থেকে পড়াশোনা করছি। গ্রাজুয়েশনের পর মাস্টার্স অবশ্যই করব। সে ক্ষেত্রে ফিল্ম স্টাডিজ নিয়ে পুনে থেকে পড়ার ইচ্ছে রয়েছে। অভিনয়ের পাশাপাশি অবশ্যই পড়াশোনাকে সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখি।

প্র: অভিনয়ের ব্যাপারে কী প্ল্যানিং রয়েছে?

দিতিপ্রিয়া : অবশ্যই এই ইন্ডাস্ট্রিতে থাকতে চাই। রানিমা'র চরিত্রের জন্য যে ভালোবাসা ও জনপ্রিয়তা পেয়েছি তার জন্য সত্যিই আমি সব দর্শকদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমার যখন ১৬ বছর বয়স তখন এই সিরিয়ালে অভিনয় শুরু করি। এই সম্মান সত্যিই বড়ো প্রাপ্তি। তবে শুধু সিরিয়ালেই নয়, সিনেমাতেও কাজ করতে চাই। বেশ কয়েকটা সিনেমায় কাজও করেছি। সম্প্রতি আমার কয়েকটি ছবি রিলিজ করেছে।

প্র: রানিমা'র চরিত্রের জন্য যে জনপ্রিয়তা তুমি পেয়েছ সেটা কীভাবে উপভোগ কর?

দিতিপ্রিয়া : দেখ, আমরা যখন টিভিতে অভিনয় করি তখন তো বুঝতে পারি না যে দর্শকের প্রতিক্রিয়া কী হচ্ছে, তবে যখন লোকের কাছাকাছি যায় তখন দেখি আমরা কতটা তাঁদের ঘরের মেয়ে হয়ে উঠেছি। এমনও হয়েছে কোথাও শো করতে গেছি, কিছু মানুষ আমাকে দেখে কাঁদছে। আমাকে ছুঁয়ে দেখতে চাইছে যে আমি সত্যি রানিমা কিনা। এইগুলো এখন ভীষণ মিস করছি।

প্র: পরিবারের সঙ্গে কীভাবে সময় কাটাও?

দিতিপ্রিয়া : খুবই ব্যস্ততার মধ্যে আমার সময় কাটে। তারমধ্যেও কিছুটা সময় বের করি। লকডাউনে অনেকটা সময় বাড়িতে কাটাতাম। গত

৫-৬ বছরে ওই সুযোগটা পাইনি।

প্র: এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি। মুম্বই নিয়ে কী প্ল্যান আছে?

দিতিপ্রিয়া : মুম্বই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করলাম। বব বিশ্বাস ছবিতে আমার একটা ছোটো রোল আছে। এর আগেও মুম্বইতে কয়েকটা ছোট প্রজেক্টে কাজ করেছি। এর মধ্যে অনুরাগ বসুর ডিরেকশনে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। মুম্বাইতে যাওয়ার ইচ্ছা অবশ্যই আছে। তবে ভালো কোনও ছবি হলে তবেই যাব।

প্র: কোন স্বপ্নের চরিত্র রয়েছে, যে চরিত্রে তুমি কাজ করতে চাও?

দিতিপ্রিয়া : বাংলায় কয়েকটা স্বপ্নের চরিত্র আছে। তার মধ্যে পথের পাঁচালির অপু দুর্গার মধ্যে দুর্গা চরিত্রটা আমার ভীষণ পছন্দের। আমি যখন অপরাজিত সিরিয়ালটা করতাম তখন সেখানে যে চরিত্রটা ছিল তার সঙ্গে দুর্গার মিল ছিল। ওই সময় আমি ভাবতাম পরে সুযোগ পেলে দুর্গার চরিত্রটা করব। এছাড়া আমার ড্রিম ক্যারেক্টার হল, ওয়েব টেলিভিশন সিরিজ 'স্ট্রেঞ্জার থিংস' এর ইলেভেনের ক্যারেক্টার।

প্র: হাতে এখন আর কী কী প্রজেক্ট আছে?

দিতিপ্রিয়া : এখন অনেকগুলোই প্রজেক্ট রয়েছে। তবে প্যানডেমিক সিচুয়েশন আমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছে। তাই আগে থেকে বড়ো কোনো প্ল্যানিং করতে চাই না। যে কাজগুলো হাতে আছে সেগুলো শেষ করতে চাই। অভিযাত্রিক, অচেনা উত্তম, মায়ামৃগয়ার মতো কয়েকটি ছবি আসতে চলেছে। এছাড়া বেশ কিছু ওয়েব সিরিজের কাজও আছে। এসবের পাশাপাশি আমি সিরিয়ালও করতে চাই।

প্র: এই মুহূর্তে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম একটা বড়ো জায়গা। সেটা নিয়ে কী ভাবছো?

দিতিপ্রিয়া : অবশ্যই ওটিটি প্ল্যাটফর্ম নিয়ে ইন্টারেস্টেড। এটাও সিরিয়ালের মতোই। একটা সিরিজ বেরোনোর পর পরের ধাপে আবার একটা সিরিজ বের হয়। সেক্ষেত্রে সময় নির্দিষ্ট করে কাজ করতে হবে।

প্র: করুণাময়ী রাসমণি সিরিয়ালের জার্নিটা কীরকম?

দিতিপ্রিয়া : ইট ওয়াজ আ কো-ইন্সিডেন্ট। ওই রোলটা করার কথাই ছিল না আমার। ওই চ্যানেল থেকে একদিন সোহিনীদি আমাকে কল করে বলল, দিতিপ্রিয়া তুই চ্যানেলে এসে একটু দেখা করিস। আমি তখন বললাম যে, সোহিনীদি আমি এখন সিরিয়ালে কাজ করতে পারবনা। কারণ সামনেই তখন আমার বোর্ডের পরীক্ষা ছিল। তখন আমাকে বলা হল, ৩ মাসের একটা রোল আছে। আমি দেখলাম তখন বোর্ডের পরীক্ষার আগেই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। তাই রাজি হলাম। লিড রোলের জন্য ওদের একটা মেয়েকেও ঠিক করা হয়ে গিয়েছিল। আমাকে নিয়ে প্রোমো শ্যুটিং হল। সেটা অন-এয়ার হল। এরপর ওরা বলল, ওই চরিত্রটা শেষ হতে তিন মাস নয় ছয় মাস লাগবে। আমি দেখলাম তাতেও আমার বোর্ডের পরীক্ষার জন্য সময় আছে। এরপর প্রথম টিআরপি এল, দ্বিতীয় টিআরপিএল এল। দর্শকরা এতটাই আমাকে পছন্দ করতে শুরু করে দিল যে চ্যানেল সিদ্ধান্ত নিল যে আমাকে আর ছাড়া যাবে না। পুরোটাই দর্শকদের পছন্দের উপর নির্ভর করে আজ আমি এই জায়গায় এসেছি। ইতিহাসে যেমনটা লেখা আছে ঠিক সেভাবেই চরিত্রটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

প্র: রানিমা সেইসময়ের একজন নারীবাদী চরিত্র বলা যেতে পারে। তার সঙ্গে নিজেকে কতটা রিলেট করতে পার?

দিতিপ্রিয়া : ওনার মত আমিও ভীষণভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করি। অন্যায় দেখলেই

তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই। তফাতটা হল এই যে, উনি খুব শান্তভাবে তার বিরোধিতা করতেন। তাতে কাজ হত। আর আমি খুব রেগে গিয়ে তার বিরোধিতা করি। তবে মনে হয় বয়সের জন্য ফারাকটা হচ্ছে। আরও বয়স বাড়লে হয়তো সেটা ঠিক হয়ে যাবে।

প্র: রানিমা চরিত্র একটা নির্দিষ্ট ইমেজ তৈরি করেছে। সেই ইমেজকে ভেঙে কীভাবে বেরিয়ে আসবে?

দিতিপ্রিয়া : রানি রাসমণির চরিত্র থেকে বেরিয়ে এসে অন্য আর একটা চরিত্রে কাজ করা সত্যিই একটু কঠিন। তবে আমি আমার ১০০% দিয়ে সেটা করার চেষ্টা করছি। এটা ঠিক দর্শক যখনই আমাকে দেখবে রানি রাসমণির কথাই তাদের মনে পড়বে। সেখান থেকে একেবারে অন্য ধরনের একটা চরিত্র করতে চাই। আসলে আমরা অভিনেতা। যতটা আমরা ভার্সেটাইল হতে পারব ততটাই আমাদের অভিনয় দক্ষতা বাড়বে।

প্র: অবসর সময় কীভাবে কাটাও?

দিতিপ্রিয়া : পপকর্নের (পোষ্য কুকুর) সঙ্গে সময় কাটাতে খুব ভালো লাগে। এছাড়া ছবি আঁকি। ওয়েব সিরিজ দেখতে আমি খুব ভালোবাসি।

প্র: পরিবারের আর কেউ অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত আছে?

দিতিপ্রিয়া : বাবা অনেক আগে অভিনয় করতেন। এখন ছেড়ে দিয়েছেন।

প্র: স্কুল থেকে অভিনয়ের জন্য কতটা সাপোর্ট পেয়েছ?

দিতিপ্রিয়া : আমি পাঠভবনে পড়তাম। সেখানের টিচাররা আমাকে ভীষণ সাহায্য করেছেন। ওনাদের জন্যই আমি পড়াশোনার সঙ্গে অভিনয়টা চালিয়ে যেতে পেরেছি।

সাক্ষাৎকার : ঈপ্সিতা সেন

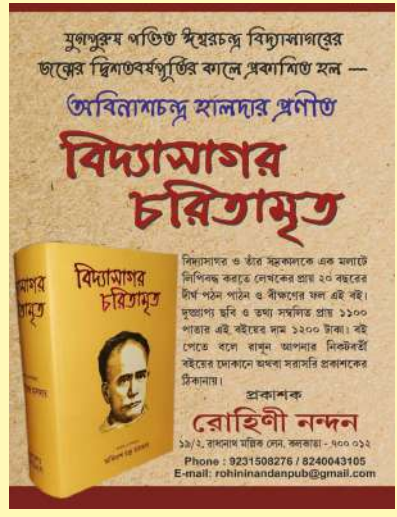

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

দেশ নায়ক নেতাজী

থাকছে নেতাজীকে নিয়ে
একগুচ্ছ বিস্ফোরক লেখা
সঙ্গে নিয়মিত বিভাগ

নতুন বছরে যে সব পেশা দিশা দেখাবে

মধুমিতা দাস

গ্র্যাজুয়েশন বা মাস্টার ডিগ্রি পাশ করার পর সব ছেলেমেয়েই চায় উজ্জ্বল কেরিয়ার গড়তে। আর এটা বলার অপেক্ষা রাখে না ভালো কেরিয়ার মানেই ভালো মাইনের চাকরি আর সেই সঙ্গে সামাজিক সম্মান। প্রফেশন বা পেশা বাছাই করা খুব কঠিন কাজ। বিশেষ করে অতিমারির পরের সময়ে, যখন সারা বিশ্বের অর্থনীতি এক সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে। তবে সেই দিন আর নেই, যখন শুধুমাত্র ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং বা সরকারি চাকরিকে মনে করা হতো সবচেয়ে বেশি মাইনের সুরক্ষিত চাকরি। এখন এর বাইরেও আমাদের দেশেই এমন অনেক চাকরি বা পেশা রয়েছে যেখানে মাইনে বেশি সেইসঙ্গে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। নতুন বছরের সেরা পেশা কী হতে পারে?

বিশেষজ্ঞরা ২০২২ সালে এই ১০টা পেশাকে সম্ভাবনাময় হিসাবে চিহ্নত করেছেন —

(১) **সিস্টেম অ্যানালিস্ট :** এই পেশার বার্ষিক রোজগার প্রায় ১৬ লাখ টাকার মতো।

(২) **ব্লকচেন :** এই পেশার কর্মীরা গড়পড়তা আয় করতে পারেন বছরে ১৫ লাখ টাকা।

(৩) **প্রোডাক্ট ম্যানেজার :** বছরে এই পেশার কর্মীদের রোজগার হতে পারে ২৫ লাখ টাকা।

(৪) **ফুল-স্ট্যাক ডেভেলপার :** বার্ষিক রোজগার হতে পারে এই পেশায় প্রায় ১২ লাখ টাকা।

(৫) **ডেভ-অপস ইঞ্জিনিয়ার :** আমাদের দেশে এই পেশার কর্মীরা বছরে রোজগার করতে পারেন ১১ লাখ টাকা।

(৬) **ডেটা সায়েন্টিস্ট :** ভারতে এই পেশার কর্মীরা এখন রোজগার করেন বছরে ১৫ লাখ টাকা।

(৭) **ক্লাউড আর্কিটেক্ট :** এই পেশার কর্মীরা বছরে আয় করতে পারেন ২৬ লাখ টাকা।

(৮) **আইওটি সলিউশনস :** এই পেশাদাররা বার্ষিক রোজগার করতে পারেন বছরে ১০ লাখ টাকা।

(৯) **সফটওয়্যার আর্কিটেক্ট :** এই পেশায় থাকলে বছরে ৪৫ লাখ টাকা পর্যন্ত রোজগার হতে পারে।

(১০) **এ আই আর্কিটেক্ট :** এই মুহূর্তে আমাদের দেশে এই পেশার কর্মীরা বছরে পেতে পারেন ৬৩ লাখ টাকা।

হারিয়ে যাওয়া খেলা ডাঙ্গুলি

উপগুপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

দুই দলের সদস্যরা যখন একে অন্যকে হত্যা করার খেলায় মেতে ওঠে, তখন তাকে আমরা যুদ্ধ বলি। যুদ্ধের শেষ পরিণতি মৃত্যু অথবা বন্দিত্ব। বন্দিত্বের শেষ কিন্তু মৃত্যুতে। যদিও অনেক ক্ষেত্রে তা শেষ হয় মুক্তিতে। আর দুটি দলের সদস্যরা যখন শুধুমাত্র জয়ী হয়ে আনন্দ পেতে চায়, পরাজয় যেখানে সামান্য গ্লানি অনুভব ছাড়া আর কিছুনয়, তখন তাকে বলা হয় ক্রীড়া। অনেক প্রাচীন কাল থেকে মানুষ নানারকম ক্রীড়ার মাধ্যমে আনন্দ, উত্তেজনা পেতে চেয়েছে। কয়েক হাজার বছর আগে অধিকাংশ ক্রীড়ার পরিণতিতে মৃত্যু হাতছানি দিত। বলিষ্ঠ চতুর ক্রীড়াবিদরা অবশ্য নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও ভয়ঙ্কর মুহূর্ত পেরিয়ে গিয়ে বিজয়ী মুকুট অর্জন করতেন। প্রাচীন কালে এশিয়ায় এমন অনেক খেলা ছিল যেখানে জীবনকে বাজি রাখতে হতো। আফ্রিকা মহদেশেও আগুনের ওপর ঝোপ কাঁটা পেরিয়ে যাওয়ার লাফের মতো বিপজ্জনক খেলার প্রচলন ছিল, যা পরে কিছুটা বিবর্তিত হয়ে অলিম্পিকে নানা রকম ইভেন্ট হয়েছে। নানা রকম উপাদান দিয়েই মানুষ ক্রীড়ার সরঞ্জাম বানিয়েছে। গাছের ডাল থেকে বানানো এমনই একটি খেলার নাম হল ডাঙ আর গুলি।

অল্প কিছুটা খোলামেলা জায়গা পেলেই অনেকজন মিলে এই খেলাটি খেলা যায়। ৩ থেকে ৬ ইঞ্চি লম্বা ছুঁচালো মুখের অনেকটাই ক্রিকেট উইকেটের বেলের মতো, কাঠের একটি টুকরো থাকে যাকে বলা হয় গুলি বা গুটি। আর এক-দেড়ফুট লম্বা যে কাঠের টুকরো থাকে, তাকে বলা হয় ডাঙ বা ব্যাট। এটিকে যেমন ব্যাটের ছোটো সংস্করণ বলা যেতে পারে। গুলির ছুঁচালো মুখ দিয়ে প্রথমে ছোটো একটি গর্ত করা হয়। গর্তের উপরে গুলিটিকে আড়াআড়ি রেখে ডাং বা ব্যাট দিয়ে গর্তের ভেতর থেকে গুলিকে দূরে পাঠানো হয়। অন্য খেলোয়াড়রা তখন সেই গুলিটিতে ক্যাচ করার চেষ্টা করে। গুলিটিকে তালুবন্দি কেউ করতে না পারলে এবার ডাং বা ব্যাট হাতে খেলোয়াড় গুলিটির যে কোনো প্রান্তে মেরে সেটিকে শূন্যে তুলে, ওই অবস্থাতেই ডাং দিয়ে মেরে দূরে পাঠায়। এবার গুলিটি যেখানে আছে সেখান থেকে ডাং দিয়ে মেপে গুলির গর্তের কাছে আসতে হয়। যে সব থেকে দূরে পাঠায় তার রান মাপা হয় মোট কত ডাং হল তার ওপর। সব থেকে বেশি রানের খেলোয়াড়ই জয়ী হয়। পরে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি স্থান নির্ধারণ হয়। আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রদেশে, গ্রামের দিকে এটি এখনও খুব জনপ্রিয় খেলা। হিন্দিতে একে গুলি ডান্ডা বলা হয়। ইরানে এই খেলার নাম আলাক দোলাক। দক্ষিণ কোরিয়ায় বলা হয় জাচিগি, রোমানিয়া ও মালদাভিয়াতে বলা হয় টুরকা, আয়ারল্যান্ডে নাম সিড আর পশ্চিম ইয়র্কশায়ারে বলা হয় নুর অ্যান্ড স্পেল। আর ইংরাজিতে এই খেলাটিকে বলা হয় টিপক্যাট।

ইটালিয়ো ক্যালভিনো বিশ্বখ্যাত ইতালিয়ান লেখক তাঁর 'ইন দ্য ডার্ক অ্যান্ড আদার স্পোরিস' নামক গল্প সংগ্রহে 'মেকিং ডু' (ইতালিয় ভাষায় চি সি কনটেন্টা) নামে একটি গল্পে লিখেছেন যে একটি রাজ্যে শুধু ডাংগুলি বা টিপক্যাট বা ইতালিয় ভাষায় লিম্পা নামক খেলাটিই আইনত সিদ্ধ। আর নাগরিকরা সারাদিন সেই খেলাই খেলে যতদিন না পর্যন্ত, সেই খেলাটিকেও নিষিদ্ধ করা হয়।

আমাদের প্রজন্মই সম্ভবত শেষ প্রজন্ম যাঁরা শহরে বসবাস করেও এই খেলাটি ছোটোবেলায় খেলেছে। ন্যূনতম খরচে খেলা যেত এবং অনেকে অংশগ্রহণ করত বলে এই খেলাটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। ডাং দিয়ে গুলিটিকে মেরে শূন্যে তুলে যদি শূন্যেই কয়েকবার নাচানো যায় তাহলে প্রত্যেকবারের জন্য দশ পয়েন্ট রান পাওয়া যেত। তবে সতর্ক না থাকলে এ খেলাটি খেলতে গিয়ে আঘাত লাগার সম্ভাবনা থাকে। এই খেলাগুলি হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখনকার প্রজন্মের শৈশবও যেন হারিয়ে যেতে বসেছে। দু-তিনটি জনপ্রিয় যেমন ফুটবল, ক্রিকেট বা টেনিস, ব্যাডমিন্টন ছাড়া অন্য সব খেলা খুব দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে। শৈশবে একাত্মবোধ, বন্ধুত্ব, মিলেমিশে খেলা ও থাকার জন্য এমন খেলাগুলোর খুবই প্রয়োজন। আমরা এই তথাকথিত গ্রাম্য খেলাগুলি হারিয়ে ফেলছি বলে হয়তো এ প্রজন্মের শিশু ও কিশোররাও ক্রমশ অনাবিল আনন্দের শৈশব থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।